



Maheshtala College Webzine of Department of Political Science

On

Human Rights

CHIEF PATRON: Dr. Rumpa Das, Principal, Maheshtala College

EDITORIAL BOARD:

Sanjibita Mondal, HOD & Assistant Professor, Dept. of Political Science, Maheshtala College

Ranajit Das, Assistant Professor, Dept. of Political Science, Maheshtala College Asis Naskar, SACT, Dept. of Political Science, Maheshtala College

COVER PAGE DESIGN: Naznin Sultana, 6th SEM, Hons, Department of Political Science



অবতরণিকা

মানব জাতির সদস্য হিসাবে মানুষ কিছু স্বাভাবিক ও শাশ্বত অধিকার ভোগ করে থাকে। মানবাধিকার হলো সেইসব শাশ্বত ও স্বাভাবিক অধিকার যে গুলি ছাড়া মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে না এবং তার সন্তার বিকাশ ঘটতে পারে না। সংবিধান বিশারদ দুর্গাদাস বসুর মতে মানবাধিকার সেই সব ন্যূনতম অধিকার গুলি মনুষ্য পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রতিটি রাষ্ট্র বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও ভোগ করে।

জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার , সম্পত্তির অধিকার , কর্মের অধিকার , শিক্ষার অধিকার , আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পৌর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ মানব অধিকারের মধ্যে পড়ে। 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জ যে সনদটি গৃহীত হয়েছিল তা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের অধিকারের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে -সেটি হল ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস। 1993 সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকার রক্ষা আইন 2(1)ঘ ধারায় বলা হয়েছে মানবাধিকার হলো ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেই সব অধিকার যেগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি পত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য।

এই পত্রিকাটির মাধ্যমে মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক গুলি সম্পর্কে অবগত করানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেমন মানবাধিকারের অর্থ প্রকৃতি ও পরিসীমা , মানবাধিকার প্রতি পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসজ্যের ভূমিকা , সার্বজনীন ঘোষণাপত্রটি , ভারতে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন , এছাড়াও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা গুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেমন নারী ও শিশুদের মানবাধিকার, উদ্বাস্ত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার।

মানবাধিকার সম্বন্ধে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত । আশা করি এই রচনাগুলির মাধ্যমে পাঠক মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাবে এবং দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হবে।

সঞ্জিবিতা মন্ডল, সহকারি অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

সূচিপত্ৰ

মানবাধিকার প্রসঙ্গে অধ্যক্ষা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কলম

Page. No-

29-31

Kanyashree Prakalpa (KP) of the West Bengal State Government:

Developmental Discourse & Gender Inclusivity

7-18

Dr Rumpa Das, Principal, Maheshtala College

রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার ও মানব উন্নয়ন

19-20

সঞ্জিবিতা মন্ডল, সহকারি অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানব পাচার রোধে এবং মানবাধিকার প্রসঙ্গে ভারতে জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা 21-25 রনজিৎ দাস, সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

বঞ্চিত দলিত ও বিপন্ন মানবাধিকারঃ বর্গ-জাতভিত্তিক বৈষম্যের অনেকান্ত কথকথা 26-28 আশিস নক্ষর, সহকারি অধ্যাপক (SACT), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

মানব অধিকারের অর্থ প্রকৃতি ও পরিধি কায়নাথ খাতুন, মধুরিমা পারভীন, অনন্যা দাস সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার 32-35 তুসিনা খাতুন , খুসবু কয়াল সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের : মানবাধিকার রক্ষার পদ্ধতি সমূহ	36-38
সুমাইয়া পারভিন ও তারানুম খাতুন	
সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ	
মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগ্সাফল্য ও ব্যর্থতা	39-44
অলিপ্রিয়া পাল ও সায়ক চক্রবর্তী, সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ	
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	45-46
সুমাইয়া খাতুন ও সারিকা খাতুন , সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ,	
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ	47-49
সারিকা খাতুন, সুমাইয়া পারভীন ও নেহা নাসরিন,	
সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ,	
মানবাধিকার ও ভারত	
ভারত ও মানবাধিকার	50-53
খালেদা খাতুন , সেখ নাগিন, কাকলি মন্ডল, আনিসা খাতুন	
সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ	
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	54-57
সাহিবা খাতুন, স্লেহা দাস ও পূজা কয়াল,	
সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ	
রাজ্য মানবাধিকার প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন	58-60
সৌরভ মন্ডল, অয়ন নস্কর ও সুদীপ সরদার,	
সেমিস্টার - ৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ	
ভারতে মানবাধিকার রক্ষায় সিপিডিআর (CPDR) এর ভূমিকা	61-63

মিনাক্ষী মণ্ডল, সেমিস্টার -৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

ভারতে মানবাধিকার রক্ষায় APDR- এর ভূমিকা

64-66

সঙ্গিদা ইয়াসমিন, সেমিস্টার -৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানবাধিকারের বিবিধ প্রসঙ্গ

লিঙ্গ বৈষম্য ও মানবাধিকার

67-71

তনুশ্রী কাড়ার, মাসকুরা খাতুন ঈষিতা সদ্দার ও নারগিস পারভিন, সেমিস্টার -৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা ও মানবাধিকার

72-74

রাকিবা খাতুন তৌসিফা খাতুন, সেমিস্টার - ৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

শিশুসুরক্ষা এবং মানবাধিকার

75-79

শারমিন নাজ, নাজনীন সুলতানা, সাবানা খাতুন, শাহিনা পারভীন ও সাবিনা খাতুন, সেমিস্টার -৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

উদ্বাস্ত্র সমস্যা ও মানবাধিকার

80-84

শঙ্কর গায়েন, আবিদ হোসেন মল্লিক ও অমিয় প্রামানিক সেমিস্টার -৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানবাধিকার প্রসঙ্গে অধ্যক্ষা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কলম

Kanyashree Prakalpa (KP) of the West Bengal State Government: Developmental Discourse & Gender Inclusivity

Dr Rumpa Das, Principal, Maheshtala College

The UNDP Human Development Report 2019 calls for 'Focussing on Inequality', a clear indicator that in spite of the concerted efforts to address specific issues as the reports from 1990 onwards have stated, there is a global need to understand the dimensions of inequality most important to people's wellbeing, and the reasons thereof. The report is expected to enquire beyond the dominant discourse that emphasizes income disparities to also mull over inequalities in other aspects such as health, education, access to technologies, and exposure to economic and climate-related shocks. Even before the 1990s, empowerment was considered the most important thrust of human development because of a paradigm shift in the development discourse. The economic growth model that linked increase in per capita GNP of a country to improved living conditions was gradually replaced following the realisation that economic growth does not translate into human development. The new paradigm stressed on issues of social justice, sustainability and inclusiveness, satisfaction of fundamental human needs, participation of masses in the development discourse. A very important document that marks the equity and inclusivity-based approach is the UNDP 2013 Report which identifies four core areas of sustainable development, of which the emphasis on enhancing equity, particularly the gender dimension and enabling greater articulation and participation of citizens, particularly the youth deserve special importance in the context of the present paper. When the UNDP agenda is read against the UNICEF data that states globally 650 million girls and women today were married before their 18th birthday, and by 2030, an additional 150 million girls under 18 will be married, the situation looks grim. This paper seeks to chart how the Kanyashree Prakalpa, the flagship project has initiated a paradigm shift in the educational, cultural and social ethos among girls in West Bengal, and will try to probe this exemplary human development initiative with a critical enquiry into certain key concepts such as empowerment, inclusivity and development, particularly in terms of education and eradication of social inequality.

Way back in 1982 in Bangladesh, the female secondary school stipend programme began as an experiment by a local NGO in a single upazila (block of a district) with USAID financial assistance under the supervision of the Asia Foundation. By 1994, beneficiaries - girl students from Class VI to X from 460 upazilas were included with funding from World Bank, Asian Development Bank and the Norwegian Agency for Development Cooperation in what was known as the Female Secondary Stipend Programme (FSSP). Later on, the programme was extended to include girl-students from Higher Secondary classes as well. The thrust of the programme was expansion of secondary education as well as sustainability, and the project named ' World's vanguard programme of the type' by World Bank also sought to probe whether the effects of the programme in changing behaviour and norms are sufficiently profound and would be sustained if the financial incentives are withdrawn. Studies by Bangladeshi scholars claimed the success of the project along with Food For Education Programme (FFEP) and attainment of gender parity in primary and secondary education, in spite of the low Gross Enrolment Ratio(GER) among girls in secondary schools, high drop out rates among girls, early marriage, high fertility and high mortality among underage mothers along with the overall deprivation of employment opportunities for women and their multiple marginalisation in society. The deplorable condition of girls in a highly radical patriarchal and religious society often combined with their economic deprivation to push them to the brink of existence. The relevance of this reference is that across the border in West Bengal, the same situation as stated in Bangladesh was prevalent till the introduction of the Kanyashree Prakalpa in 2013.

The Kanyashree Prakalpa is a Conditional Cash Transfer Scheme launched on 8th March (International Women's Day), 2013 by Hon'ble Chief Minister of West Bengal, Miss Mamata Banerjee that concentrates on girls currently most at-risk of dropping out of school and being forced child marriage.Kanyashree Prakalpa attempts to retain girls from dropping out after Class 8 with a promise of an annual grant, as well as a larger one-time grant if the girl is still unmarried at 18 years. Kanyashree Prakalpa targets girls between the ages of 13 and 18 years, studying in Classes 8-11, as the dropout rate is the highest for this age group. The intervention has been a clever move, since it is introduced just as the central government-sponsored support for the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)—which provides for free and compulsory education till Class 8—ceases. It aims to push girls towards education, as well as take some of the expense away from the family. The benefits can be availed by families with an annual income of ₹1.2 lakh or below, and the scholarship is given in two tiers. At first, an Annual Scholarship (K1) of ₹750 is given to unmarried girls between the ages of 13 and 18, enrolled in any government-recognised educational institution. Second, a One-time Grant (K2) of ₹25,000 is given to unmarried girls on completion of 18 years of age, who are part of an academic institution,

vocational institution, or a sports institution. The scheme also makes provisions for girls with special needs, orphaned girls, and girls residing in juvenile homes by waiving the income criterion, as well as allowing them to apply for the scholarship even before they reach Class 8. Thus, the social inclusiveness of the scheme ensures that all girls benefit.

In July, 2017, the state's Higher Education Department issued an order that had been mulled for quite some time, and included Kanyashree girls who desire to pursue postgraduate education under the Swami Vivekananda Merit cum Means Scholarship Scheme's K-3 Component. In this scheme, the Kanyashree girls, either single or married, may apply for financial assistance, if they get at least 45% marks in their graduation and enroll themselves for post graduate studies, and will receive Rs 2000/-per month for Post graduate studies in arts and commerce and Rs 2500/- per month for Post graduate studies in Science.

Currently, over 40 lakh girls are beneficiaries of the scheme, which attempts to combat the increasing rate of child marriages in West Bengal. The state ranked high in terms of underage marriages of girls according to the District Level Household and Facility Survey–3 (DLHS–3), conducted during 2007–08, and the National Family Health Survey (NFHS–3), conducted during 2005–06. This prompted the Government of West Bengal to intervene in the education sector. Considering the relationship between child marriages and the dropout rate of girls, the objective of the scheme was to both tackle the rate of girl dropouts from school, as well as delay the marriages of girls.

According to the state government website, the aim is to ensure that girls remain in school, so that they gain requisite skills and knowledge, which will allow them to become economically independent. It states,

Even if girls do get married soon after they turn 18, it is expected that their education and enhanced social and emotional development will give them a

better foundation for in their adult lives [...] as entire generations of women begin to enter marriages only after attaining some degree of economic independence, the practice of child marriage will be eradicated.

The Annual Report of Kanyashree Prakalpa for 2015–16 bears witness to the fact that an increasing number of beneficiaries are being encouraged to continue their schooling and are targeting the one-time grant of ₹25,000 (Department of Women Development and Social Welfare 2016). According to a rapid assessment made by government in nine schools in three districts of West Bengal, namely Purulia, Malda, and North 24 Parganas during April–June 2015, it was found that the enrolment of girls between Classes 8–12 has increased from 9,021 in 2013–14, to 9,329 in 2014–15 (an increase of 3%). The increase in enrolment rate has significantly improved the presence of girls at the secondary and higher secondary levels (Classes 9 and 11) which signifies that more students are graduating from secondary to higher secondary.

The number of girls dropping out of school has reduced from 161 in 2013–14 to 71 in 2014–15 (a decrease of 56%). It was also found that in the schools evaluated, in 2013–14, 132 girls had been married prior to attaining the legal age. This figure reduced to 89 girls in 2014–15, showing a 33% decrease in child marriage rate.

On 24 June 2017, the Government of West Bengal was declared the winner of the United Nations Public Service Award at The Hague for its flagship scheme known as Kanyashree Prakalpa, which provides educational support to unmarried girls through conditional cash transfers. India stood first in the Asia-Pacific group for the category "Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Participation," with the Government of West Bengal being the receiving institution. The scheme was introduced by Hon'ble Chief Minister Miss Mamata Banerjee in 2013, and the award was celebrated with much fanfare. In the six years since its inception, the scheme has gained national and international recognition, and has

received six different awards, including the National Awards for e-Governance 2014–15 by the central government's Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

The following are Year-wise statistics: [3]

eme Type	3-14		4-15		5-16		6-17		7-18		Date	
	oad	ction	oad	ction	oad	ction	oad	ıction	oad	ction	oad	ction
nual olarship(14,99),94),061	1,13	5,169),91	7,637			52,1) 6,85
ıewal(K1)			22,9)4,92	32,8	76,26	55,2	51,87),04	354	11,1	16,91
: Time nt(K2)	1,19	3,965	138	126) 77	}59	506	180			5,91) ,930
gradation)			5,73),304	1,82	5,710),09	5,394	338		9,48	2,533

• Total K1 Girls Since Inception: 39,61,947

• Total K2 Girls Since Inception: 11,14,566

In order to assess the range and extent of the impact of Kanyashree Prakalpa, a study was conducted over the past three months for the following objectives among three hundred girl-students, 100 parents and 10 teachers of Maheshtala College.

The objectives of the study were:

- 1. How the funds received are utilised by the students?
- 2. How has the project impacted the academic interests of the students?
- 3. What are the problems encountered by the students in this scheme?
- 4. How has the scheme helped the students in their family life?
- 5. How has the project helped the girls in thinking about their future?
- 6. How has the project impacted their personality?

Methodology of research:

A structured open-ended questionnaire was prepared and the study was carried on from November 2018 to February 2019. The primary data was collected from the respondents and collated with secondary data to arrive at the inferences. The primary data comprised of government website, UDISE Flash statistics 2016-2017, interviews with bureaucrats such as Commissioner

of School Education, Govt of West Bengal and Additional State Project Director, Women & Child Development, Govt of West Bengal, and headmasters and headmistresses of different schools. Secondary data comprised of publications by educationists and bureaucrats as detailed in the bibliography. For the sake of this paper, only data collected from students are being presented, after analysis.

Analysis and interpretation of data from students:

1. How the funds received are utilised by the students?

35% students reported that their parents invested the amount in banks for their future (higher studies/marriage), 58% said the amount was used for their studies and the rest 5% said for other purpose and 2% admitted that they had no idea about it. Since most of the girls opened bank account only for the sake of the project, they felt safe that their parents are deciding about the money. However, 58% respondents also asserted that the money was spent in paying college fees, buying books, tuition etc.

2. How has the project impacted the academic interests of the students?

78% of girls said that the project has made them more serious in studies because now they were sure about continuing studies, 19% said their studies have not been affected and 3% said they were not sure.

3. What are the problems encountered by the students in this scheme?

26% students reported that they had problems with online registration, 14% reported that they had bank-related problems, 7% said that their schools

were not cooperating and 53% said they didnot face any problem with K1 or K2.

4. How has the scheme helped the students in their family life?

23% students reported that earlier their parents would talk of marriage and even start negotiation; however, now with the KP fund, the parents feel they should let their daughters complete their graduation first. Only 4% girls reported that their parents still felt they should get married before it is too late, even if they have to give up studies, and rest 73% say KP has actually helped them financially and to an extent supplemented their family income. They can continue their studies without any hindrance or in common parlance, 'becoming a burden'to their families.

5.How has the project helped the girls in thinking about their future?
53% girls said they shall continue with higher studies after graduation, 27% reported they will be able to complete their graduation studies which was impossible to do without financial assistance, 20% said that even if they get married, they will supplement their family income by small jobs, private tuition to kids etc.

6. How has the project impacted their personality?

56% girls said that they were happy that they have their own money, 23% said they are confident of their future, 20% said that they felt more responsible for their families and only 1% said that it didnot make any difference.

Before arriving at any conclusion, it is important to understand the key concepts of empowerment and inclusivity so as to understand the holistic value of a scheme such as Kanyashree over similar other projects like the 'Beti parao, beti bachao', Sukanya Samriddhi, Apni Beti Apna Dhan programmes.

In Empowerment: The History of a Key Concept in Contemporary Development Discourse, author Anne-Emmanuèle Calvès outlines the many origins and sources of inspiration of the notion of empowerment that can be traced back to such varied domains as feminism, Freudian psychology, theology, the Black Power movement, and Gandhism (Simon 1994; Cornwall and Brock 2005). Empowerment refers to principles, such as the ability of individuals and groups to act in order to ensure their own well-being or their right to participate in decision-making that concerns them (Simon 1994). Early theories of empowerment are rooted in a philosophy that gives priority to the points of view held by oppressed peoples, enabling them not only to express themselves, but also to gain power and overcome the domination to which they were subject (Wise 2005). Among the many inspirations for writings on empowerment, one of the foremost is the conscientization approach developed by the Brazilian theorist Paulo Freire in his Pedagogy of the Oppressed, published in 1968. According to Freire (1974), in every society a small number of people exert domination over the masses, resulting in "dominated consciousness." In Women's Empowerment in South Asia: Concepts and Practices, published in 1993, Srilatha Batliwala defines empowerment as a process of transforming the power relationships between individuals and social groups. Batliwala argues that power relationships can only be changed through action on three different fronts: by questioning the ideologies that justify inequality (such as social systems determined by gender or caste), by changing the means of access and control of economic, natural, and intellectual resources, and by transforming the structures and institutions that reinforce and preserve existing power systems (such as family, the state, the market, education, and media). Joining Batliwala are other feminists, such as Naila Kabeer (1994), Magdalena León (1997), and Jo Rowlands (1995), who emphasize that empowerment differs from holding "power of domination" over someone else ("power over"); it is more of a

creative power that can be used to accomplish things ("power to"), a collective political power used by grassroots organizations ("power with"), and also a "power from within," referring to self-confidence and the capacity to undo the effects of internalized oppression.

The 1995 World Summit for Social Development (WSSD) at Copenhagen endorsed a coherent people-centred approach to development, noting the importance of social integration as the key to creating a society for all that supports eradicating poverty and generating productive employment for all. The need for inclusionary approach in policies that fight existing divisiveness and exclusionary tendencies that are almost inherent in all societies due to age-old factors of discrimination, control, various oppression authoritarian mindset and approaches. The primary constraint for achieving social integration is the implementation of inclusive policy directives that augur well at the decision-making stages but face insurmountable problems once the policies are operationalised - a major constraint is the lack of capacity at the national/state-levels to transcend the condescending approach of the mainstream towards the excluded marginalised section and actually allowing their concerns to be programmed and incorporated in the planning process.

However, as far as empowerment and inclusive policies for women are concerned there are a few In fact, the development narrative casts its gaze evenly across a range of women, homogenises experiences and contexts, refuses to delve deeper into women's life experiences, and is content to have counted women as participants, beneficiaries, victims, and case studies. Most policy makers are content to have women counted in, but not necessarily explored the complex socio-political, cultural and economic dynamics that they live through everyday.

The Kanyashree scheme , however, has been able to be inclusive and empowering in these counts since it tackles the root-cause of all disparities, which is financial inequality. The Conditional Cash Transfer incentive has not only been able to spread education among the most vulnerable part of the population, it has also reduced child marriage since one of the conditions of the scheme is remaining unmarried. In a way, it has also helped girls build a level of self-conviction and forge an awareness about the benefits of higher education, employment and empowerment. It has been, in a tangential way brought about a paradigm shift in the mindsets of poor households who are now in no hurry to marry off the girls and do not consider them to be burdens, thereby initiating a sea-change in the social perception towards girls. It signals an addition of value to the way many households viewed the birth of a girl-child, and in a significant way, may also pave the way for zero tolerance for female foeticide and female infanticide.

References:

1. Ghara, T K,& Roy, Krishna. 'Ímpact of Kanyashree Prakalpa – Districtwise Analysis', IOSR Journal of Humanities & Social Sciences (IOSR-JHSS), Vol 22, Issue 7, Ver.7 (July 2017)

e-ISSN: 2279-0837

- 2. Kanrar, Nitu Roy 'Impact of Kanyashree Prakalpa on the Academic Development of students', IJRAR Vol 5 Issue 3, July-Sept 2018
- 3. Prakash, Amit. Índian Development Discourse in a Changing World'.

https: www.researchgate.net/publication

4. U-DISE Flash Statistics on School Education in India 2016-201

----XXXXXX-----

রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার ও মানব উন্নয়ন

সঞ্জিবিতা মন্ডল, সহকারি অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,মহেশতলা কলেজ

সাম্প্রতিক কালে উন্নয়ন শব্দটি কে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। উন্নয়ন বলতে শুধু জাতীয় আয় উৎপাদন বৃদ্ধি গুলিকে বোঝায় না প্রতিটি মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ঘটিয়ে তার মানবিক সত্তার বিকাশ ঘটানো হলো উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নের এই ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচেষ্টায় এই ব্যাপারে UNDP কে যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, মাহবুব উল হক, গুস্তাভ রেইনি প্রমূখ। উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া কে বোঝায় যা জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছাড়া প্রত্যেক মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ তথা মানবতার বিকাশ ঘটাতে চায় যা মানুষের আয়ুদ্ধাল জ্ঞান-বৃদ্ধির প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানব জীবনের উন্নতি ঘটাতে চায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল মানব উন্নয়ন সূচক।

1990 সাল থেকে জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য মানব উন্নয়ন সূচক ব্যবহার করা হচ্ছে যা হলো মানুষের পছন্দের বিষয়গুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। এগুলি হল দীর্ঘ নিরোগ জীবন যাপন, শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া এবং একটি সন্তোষজনক জীবনযাত্রার মান ভোগ করা। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি সূচকের গড় তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে মানবাধিকার সেটি হল উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার এই অধিকার ব্যক্তি তথা সমষ্টিগত অধিকার রূপে গৃহীত। উন্নয়নের অধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয় উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র টির মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার প্রস্তাবনা নম্বর 41/128 এর মাধ্যমে 1986 সালের 4 ডিসেম্বর এই ঘোষণাপত্রের প্রথম ধারা বলা হয় যে উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার যার মাধ্যমে সকল মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে অধিকার প্রযুক্ত করে থাকেন। এই ধারা অনুযায়ী যে সকল উন্নয়নের উপাদান পাওয়া যায় সেগুলি হল : আত্ম নির্ধারণের অধিকার , সমসুযোগের অধিকার, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমতার অধিকার, উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা ,অবদান রাখা তথা তাঁর উপভোগ সংক্রান্ত অধিকার , রাজনৈতিক ,সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ফলে সমান ও ন্যায্য অধিকার এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে 1981 সালে African charter on Human and people's Rights এর 22 ধারা অনুসারে উন্নয়নকে ব্যক্তিগত ও সমগ্র মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভিয়েনা শহরে অনুষ্ঠিত 1993 সালের বিশ্ব সম্মেলনে উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার রূপে আলোচিত হয়। এই সম্মেলনে ভিয়েনা ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি গৃহীত হয় যার 10 ধারা অনুসারে উন্নয়ন ও মানবাধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান হলো উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকারের ভিত্তিপ্রস্তর। উন্নয়ন ও মানবাধিকারের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সূত্র সর্বপ্রথম এই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যে সকল রাষ্ট্র মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে তারা এই উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার কে রক্ষা এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের জাতীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার কে বাস্তবায়িত করে। রাষ্ট্রগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সকল সম্প্রদায়ের প্রাথমিক মানবাধিকার রক্ষা করা , তার উন্নতি সাধন করা এছাড়াও উন্নয়নের অধিকার আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন রাষ্ট্র গুলির সমান অধিকার ও বিভিন্ন সম্প্রদের উপর সমান বন্টনের অধিকার দায়িত্ব দেয় যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন উন্নয়ন সূচক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় অগ্রগতি ঘটাতে পারে।

সমকালীন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই বেশ কিছু সমস্যা আছে যার মধ্যে দারিদ্র ,শিশুর মৃত্যু, শিক্ষার অভাব, বিভিন্ন প্রকারের রোগ উল্লেখযোগ্য এগুলোর সমাধান না করলে মানব উন্নয়ন অসম্ভব। 2000 সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসভ্যের সব দেশ গুলো সম্মিলিতভাবে একটি অঙ্গীকার করে যেটা সমগ্রভাবে বলা হয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals).

এখানে ৪ টি লক্ষ্য কথা বলা হয়েছে: দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ , সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা , নারী পুরুষ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন , শিশুর মৃত্যু নির্মূলকরণ , মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন , বিভিন্ন রোগব্যাধি দমন , পরিবেশের উন্নতি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার একটি সুপার রাইট। এই অধিকার পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য মুছে ফেলেছে এর উদ্দেশ্য হল মানব স্বাধীনতার সর্বত্র প্রযোজ্য নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরা যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ঘটে সকল মনুষ্য জাতি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের অবদান রাখতে পারে যার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে।



মানব পাচার রোধে এবং মানবাধিকারের প্রসঙ্গে ভারতে জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা

রনজিৎ দাস, সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানব পাচারে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় জড়িত যেমন মানবাধিকার লজ্ঘন , স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সুরক্ষা এবং নির্যাতন ও অবৈধ অভিবাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার। মানব পাচার আজ এক ধরনের দাসত্ব এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের রুপ নিয়েছে। মানব পাচার মূলত মানুষের মানবাধিকার লজ্ঘন করে। মানবাধিকার হ 'ল প্রতিটি মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার যা ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে না। এগুলো মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান, সাম্যতা এবং মানবাধিকারের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা ঘোষণাপত্র এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়েছিল যে: "সমস্ত মানবাধিকার সার্বজনীন, অবিভাজ্য এবং আন্তঃ নির্ভর ও আন্তঃসম্পর্ক। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার একই পদক্ষেপ এবং ন্যায্য ও সমমানের আচরণ করতে হবে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক , সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমি তাৎপর্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে , তবে রাষ্ট্রগুলির তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা প্রচার ও সুরক্ষা করবে"।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলি জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে। সামাজিক সুরক্ষা , অর্থনৈতিক সুরক্ষা এবং আইনি সহায়তা না থাকার কারণে দরিদ্র পরিবারগুলোর এক উদ্বেগজনক সংখ্যক মহিলা পাচারের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। পাচারের শিকার ব্যক্তিরা সাধারণত অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং দাস শ্রমের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। মহিলাদের জোর করে পতিতাবৃত্তির জন্য পাচার করা হয়। পাচারে শিকার বেশিরভাগ মহিলারা এইচআইভি সংক্রামিত এবং এই ফলে দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে। নারী ও শিশু পাচার বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয় , কারণ এটিতে মৌলিক মানবাধিকার লজ্যনের সাথে জড়িত।

জাতীয় মহিলা কমিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান সংশোধন ও আইনানুগ আইন যেগুলি মহিলাদের জন্য সমান জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা। মহিলাদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের

সহিংসতা বা শোষণ রোধ করতে
কমিশন টি গঠন করা হয়েছিল।
মহিলারা দুর্বল এবং তাদের সম্মুখীন
সমস্যা গুলো অসংখ্য এবং তাদের
অধিকার সম্পর্কিত ও নারীদের
অভিযোগ দূর করার জন্য এবং সমস্যা
সমাধানের জন্য জাতীয়
মহিলা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা
হয়েছিল। সমস্ত স্বার্থের কথা মাথায়
রেখে জাতীয় মহিলা কমিশন বিল



১৯৯০ লোকসভায় প্রস্তাব করা হয়। সেই অনুসারে জাতীয় মহিলা কমিশন স্থাপিত হয়। জাতীয় মহিলা কমিশন আইন , ১৯৯২ সারা ভারতে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। সরকারকে এমন নীতি ও আইন তৈরির পরামর্শ দেয় যা নারীর অধিকার রক্ষায় এবং সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন। কমিশন সংসদে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন।

জাতীয় মহিলা কমিশন সুপারিশ অনুসারে মানব পাচারের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ আইন খসড়াযার মধ্যে অপরাধের জাতিসংঘের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পাশাপাশি এ জাতীয় সমস্ত তৎপরতা রোধে একটি কেন্দ্রীয় নোডাল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিহার , ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে মানব পাচারের ক্রমবর্ধমান মামলার বিষয়টি পর্যালোচনা করে জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW) এই অপরাধ রোধে স্বরাষ্ট্র ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের একটি তালিকা প্রেরণ করেছে।

জাতিসংঘ কনভেনশন ২০০০ এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংজ্ঞা এবং "দুর্বলতার অবস্থার অপব্যবহার" শব্দটি সহ প্রোটোকলটি অন্তর্ভুক্ত করে যা মানব পাচার , বিশেষত নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করেছে IPC 370 ধারা। সংস্থাটি ভারতের বাইরে যে কোনও অপরাধ বা মানব পাচার লজ্মনের জন্য এখতিয়ারের ধারাটি বাড়ানোর ও সুপারিশ করেছে। NCW তদন্ত কমিটি বলেছে , বিশেষ আইনটিতে আইন প্রয়োগকারী, অভিবাসন বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা পুলিশ প্রশিক্ষণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশন মানব পাচার বিরোধী সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় নোডাল কর্তৃপক্ষ গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল এবং বলেছে যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়গুলি পাচারের সাথে জড়িত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। দিল্লি ও গোয়ায় জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW) এবং দিল্লি কমিশন ফর উইমেন (DCW) ২৫ শে জুলাই, ২০১৮, মানব পাচারের শিকার হওয়া মেয়ে শিশু ও মহিলাদের উদ্ধার করেছে।

গত দুই দশকে, খরা, বন্যা এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফলে জাতীয় সীমানা এবং দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃসীমান্ত পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিকম্প এবং বন্যা ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং মানুষকে পাচারের জন্য ঝুঁকির করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, কচি ভারতের নদীর বন্যা ২০০৮ সালে বিহার রাজ্য কে বিধ্বস্ত করেছে , ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল গুলি থেকে 12,000 এরও বেশি শিশু মেট্রোপলিটন শহরে পাচার করা হয়েছে। নিয়মিত বিরতিতে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কলকাতা এবং বাংলাদেশের নিকটবর্তী সুন্দরবন ডেল্টা



অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চল
হিসাবে বিবেচিত হয়। এই জাতীয়
কারণগুলি পাচারের জন্য মানুষকে
দুর্বল করে তোলে । ২৫ শে এপ্রিল ,
২০১৫-তে ভূমিকম্পের পরে হাজার
হাজার নারী ও শিশু নেপালের
ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল থেকে ভারতে পাচার
করা হয়েছে। পাচার রোধে ভারতে
জাতীয় মহিলা কমিশন বিশেষ উদ্বগ

নিয়েছে।

মহিলা জ্রণহত্যা আমাদের সমাজে একটি অপরাধ এবং অন্যান্য পাচার যেমন নারী পাচার , অপহরণ এবং নারীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ও সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি করে। ২০১১ সালে , প্রায় 15000 ভারতীয় মহিলা ও মেয়েদের একটি অনুমান যে অঞ্চলে নববধূ হিসাবে কেনা বেচা হয়, যেখানে জ্রণহত্যা নারীদের সংকট দেখা দিয়েছে। মেয়েদের অভাবের কারণে পাচার ও পতিতাবৃত্তি বেড়েছে। যদি পুরুষ-মহিলা অনুপাত হ্রাস অব্যাহত থাকে , ভবিষ্যতে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মহিলারা যৌন শিল্পে পাচার হয় যৌন পর্যটনের চাহিদা মেটাতে। তাই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে এই উন্নয়নের বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

মানব পাচারের ফলে মানুষের মানবাধিকার লজ্ঘন হয় , যেমন নির্যাতন বা দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার এবং ব্যক্তির অন্যান্য অধিকার, যেমন স্বাধীনতা এবং সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। মানব পাচার এইচআইভি সহ রোগের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনের অধিকার লজ্ঘন করে। বিশেষত যেসব ভুক্তভোগীরা বাণিজ্যিক যৌন শোষণের জন্য পাচার হয় তাদের এইচআইভি এবং অন্যান্য এসটিডি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। পাচার হওয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্থদের জন্যই সুরক্ষা হুমকি নয়। এইচআইভির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ এবং মিডিয়াগুলির সহযোগিতায় মানবিক সুরক্ষা জোরদার করা যায়। রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে পাচারের ঘটনাটি জনগণের বোঝাপড়া বাড়াতে মিডিয়াগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থার অংশ হিসাবে , দুর্বল শ্রেণীর গুলির জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিকাশ কর্মসূচী বৃদ্ধি করা জরুরী। এই সব পিছিয়ে পরা ও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের সামাজিক , অর্থনৈতিক এবং মানব উন্নয়ন সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। যা কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং মাইগ্রেশন নিয়ে কাজ করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দুর্বল লোকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো খুব জরুরি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জাতীয় টেলিভিশনে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করতে পারে এবং এনজিও গুলি পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষ এবং মহিলাদের দুর্বলতা হ্রাস করতে পারে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে যা পাচার রোধে সহায়তা করবে। বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট সরকারের সাথে নীতিমালা আলোচনার সময় প্রতিরোধের পক্ষে পরামর্শ দিয়ে মানব পাচার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। মানব পাচারের সাথে সম্পর্কিত এইচআইভি, অঙ্গ বাণিজ্য, মহিলা জ্রণহত্যা ইত্যাদির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মিডিয়া এবং সুশীল সমাজকে অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে এবং পাচারের বিষয়টি জনগণের কাছে পৌঁছাতে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা কার্যকর করেছে "কন্যাশ্রী প্রকল্প "। এই প্রকল্পের অধীনে বালিকা শিশুরা

সরকারের কাছ থেকে
আর্থিক সহায়তা পাচছে।
এটি বিশেষত পল্লী
অঞ্চলে অর্থনৈতিক
সমস্যার মুখোমুখি
মহিলা এবং শিশুদের
দুর্বল অংশগুলির পক্ষে
খুব সহায়ক হবে।
বিষয়টি জাতীয় সরকার
বা অন্যান্য রাজ্য
সরকার তথা দক্ষিণ



এশিয়ার দেশগুলো দ্বারা অনুমোদন করা উচিত যা প্রক্রিয়াটিতে নারী ও শিশুদের অবৈধ পাচারের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, মানব পাচার হ'ল আধুনিক দিন দাসত্ব এবং মানবতার বিরুদ্ধে বিশেষত নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ ।এটি কেবলমাত্র মৌলিক মানবাধিকার লজ্মন নয় , ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক মর্যাদা ও সুরক্ষা প্রশ্ন রয়েছে ।এই বিষয়ে জাতীয় মহিলা কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

যেহেতু নারী ও শিশু পাচারের পিছনে দারিদ্র্য অন্যতম প্রধান কারণ, তাই দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি এবং মানব উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি একটি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সমস্যা যা অবশ্যই সমস্ত সরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা সমাধান করা উচিত এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিভিন্ন আইন চালু করার ফলে সমস্যার সমাধান হবে না , পাশাপাশি যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য জাতীয় মহিলা কমিশনের মতো স্বয়ং শাসিত সংস্থা উদ্বগ।

বঞ্চিত দলিত ও বিপন্ন মানবাধিকারঃ বর্ণ-জাতভিত্তিক বৈষম্যের অনেকান্ত কথকথা আশিস নক্ষর মহেশতলা কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সমস্ত মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং তাদের মর্যাদা ও অধিকার সমান।মানবাধিকার কোন বিমূর্ত ধারণা নয় , কোন দেশের সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিকাশের স্তরের ওপরেই মূলত নির্ভরশীল। মানবাধিকার বলতে সেই সমস্ত নূানতম অধিকার গুলিকে বোঝায় যেগুলি না থাকলে মানুষ নিজেকে বিকশিত করতে পারেনা। মানুষের জীবনধারণের অধিকার , স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার যার সাথে মানবাধিকার ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এক কথায় বলা হলে মানবাধিকারকে পৌরঅধিকার , সমাজ- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।তবে মানবাধিকারের সাথে মানবাধিকার লজ্মনের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। গত শতান্দীর দুটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব যুদ্ধ যা ছিল মানবতাবিরোধী। যেখানে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের চরম অবমাননা লক্ষণীয় ছিল। যার ফলে জন্ম নিয়েছিলো মানুষের মনে মনবাধিকার সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা ও উদ্দ্যগ। যে কারনে সম্মলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র গৃহীতহয়। ওই ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছিল - জাতিপুঞ্জ এর মূল লক্ষ্যই হল পরবর্তী প্রজন্ম সমূহকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা এবং মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের ব্যাক্তি সন্তার মর্যাদা ও মুল্য এবং পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার এর প্রতি আস্থা পুনরুচ্চারন।

উপনিবেশিক শাসনের সময় থেকেই ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের সুত্রপাত। বেঁচে থাকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ভারতের সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানবাধিকার লজ্মনকে প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উৎসাহ দিয়ে এসেছে । ক্রুমোচ্চ-স্তরবিন্যস্ত বর্ণ- জাতপাত কেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজ যেখানে উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও নিম্নবর্ণের শোষণ আজও অব্যাহত। মানবাধিকার লঙ্মন এর প্রশ্নে তাই ভারতীয় জাতপাত ব্যবস্থাকে অনেকাংশে দায়ী করা যায়।

ভারতীয় সমাজে বর্ণ- জাত ব্যবস্থা সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে রেখেছে। এই স্তরায়ন এর মাধ্যমে উচ্চবর্ণের আমানবিক শোষণ আজও অব্যাহত।ভারতীয় সমাজে বর্ণ- জাত ব্যবস্থা যা জন্ম দ্বারা নির্ধারিত। তবে এটি অপরিবর্তিত নয়। এই বর্ণ- জাত ব্যবস্থার সাথে দুটি বিষয় গভীর ভাবে

সম্পৃক্ত। একটি জন্মসুত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা বা আরোপিত মর্যাদা ও অপরটি হল অর্জিত মর্যাদা , যা অর্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মর্যাদা। এটি সমাজে সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। আরোপিত মর্যাদা সমাজে ব্যাক্তির স্থান নির্ধারণ করে। ফলে সমাজে উচ্চবর্ণের অমানবিক পীড়নের শিকার হয় নিম্নবর্ণের মানুষেরা। এই বর্ণ- জাত ব্যবস্থা একটা এমন মানসিকাতার জন্ম দেয় , যা সমাজে উঁচুজাত ও নিচুজাত এই ভেদকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। যা সমাজস্থ মানুষের মধ্যে একধরনের বিদ্বেষের জন্ম দেয়। সমাজে মানুষের বিকাশের পথকে অমসৃণ করে তোলে। তাদের ন্যূনতম আধিকার গুলো থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে দিয়ে।

উচ্চবর্ণের দ্বারা সাম্প্রতিকতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাটি হল হাথরাস এর ঘটনা।যার নৃশংসতা নিয়ে সমগ্রদেশের মানুষের মনকে বিধ্বস্ত করেছিল ় তোলপাড় করে উঠেছিল দেশের সমাজ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। আজ একথা আর মানতে অসবিধা নেই <u>, ভারতে বর্ণ-জাতপাত</u> ব্যবস্থা চিরদিন উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণ অর্থাৎ অবদমিত শ্রেণীর ওপর নিপীডনকে সমর্থন দিয়ে চলেছে।বিশেষ করে দলিত নারীর মানবাধিকার লংঘন ও তার বীভৎসতা আমাদের মানবিকতাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। একজন দলিত নারী, প্রথমে নারী হিসাবে তার মানবাধিকার লক্ষিত হয়, দ্বিতীয় সে দলিত হিসাবে এবং তৃতীয় গরিব হিসাবে তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। প্রদেশ রাজ্যের হাথরাস জেলার ঘটনা। উচ্চবর্ণের নৃশংসতার চিত্র, অত্যাচারী মনোভাবকে আবারও উপস্থাপিত করল। কি অপরাধ ছিল নিম্নবর্ণের মেয়ে মনীষার ? ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২০ খামার বাড়িতে সে তার মা আর ভাই এর সাথে গরুর জন্য ঘাস কাটতে এসেছিল। বাড়ি ফেরার পথে উচ্চবর্ণ ঠাকুর পরিবারের চার জনতাকে তুলে নিয়ে যায় এবং দৈহিকভাবে অত্যাচারের পর ফেলে দিয়ে যায় জঙ্গলে। এই ঘটনার পর তার ভাই প্রথমে থানায় গেলেও পুলিস তার অভিযোগ নিতে চাইনি বরং অচেতন মেয়েটিকে দেখে বলেছে তোমার বোন নাটক করছে। অনেক চাপাচাপি তে অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনা জানার পর কোন পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাননি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আলিগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার বলেছিলেন, দুটি হাত দুটি পায়ে কোন সাড়া নেই , মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তিন দিন বাদে মেয়েটি তার মাকে সমস্ত ঘটনা বলে। কিন্তু তারও তিনদিন বাদে পুলিশ আসে মেয়েটির জবানবন্দি নিতে। তারও ছয় দিন বাদে এফআইআর-এ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনার পর বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করাহয় মনীষার বাড়ির লোকজনদের। উচ্চবর্ণের সেই ভয় কাটিয়ে বহু লোকজন হাসপাতালের সামনে এই ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। ২৯শেসেপ্টেম্বর ২০২০ মনীষা মারা যায়। সেই রাতেই কাউকে না জানিয়ে পুলিশ তার নিথর দেহকে পুড়িয়ে দেয

প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের মানবাধিকার লজ্মিত হতে থাকে । ৯৩শতাংশ মামলা আদিবাসি নিগ্রহ নিয়ে, এখনো আদালতে পড়ে আছে। ৫৪শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত বেকসুর খালাস হয়েছে। একথা বলতে আর আপত্তি থাকা উচিত নয় , উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। পুলিশ প্রশাসন এখানে বধির।

এটা স্পষ্ট যে , ভারতীয় স্তরায়িত সমাজে মানবাধিকারের অস্বীকার , একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতীয় সমাজ নানা দিক থেকে স্তরায়িত। এদের মধ্যে তিনটি বিশেষ রূপ ভয়ঙ্কর। ১) অর্থনৈতিক স্তরায়ন ২) বর্ণ-জাতগত স্তরায়ন ৩)লিঙ্গণত স্তরায়ন। বর্ণ-জাতগত স্তরায়ন অন্যান্য বৈষম্যমূলক স্তরায়নের সাথে গভীর ভাবে সংযুক্ত। এই সামাজিক স্তরায়নের অস্তিত্ব থাকার কারণে, ভারতবর্ষে বর্ণ-জাতিগত, শ্রেণীগত এবং লিঙ্গ বৈষম্য একটি কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে, মানবাধিকার যে বারংবার লজ্যিত তো হবেই , তা আর বেশি কথা কি। তাই মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে বৈষম্য নিরসন প্রয়োজন। বাবা সাহেব আম্বেদকার এর আহ্বানটি হলো --শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও এবং সংগ্রাম শুরু করো।

----XXX-----

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

মানব অধিকারের অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি

কায়নাথ খাতুন, মধুরিমা পারভীন ও অনন্যা দাস সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানব অধিকারের সংজ্ঞা:- মানবাধিকার বলতে বোঝায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও সাধারণ ব্যক্তি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতার অধিকার । পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য সর্বজনীন সহজাত। যেগুলি লংঘন করা যায়যেগুলি লংঘন করা যায় না

মানবাধিকার এর মতে । মানব অধিকার প্রতিটি
মানুষের অধিকার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য মানুষ এই
অধিকার ভোগ করবেন এবং চর্চা করবেন । মানব
অধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমান
ভাবে ব্যবহারযোগ্য । একই সঙ্গে এই অধিকার
হলো সহজাত ও আইনগত অধিকার । পরিবার ও
সমাজের কর্তা তারা তাদের অধিকার রক্ষা করবে।



আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানব অধিকার হলো কতকগুলি সীমাবদ্ধ আইন বা নিয়ম যা মানব জাতি সদস্যের বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় এবং স্থানীয়, আন্তর্জাতিক আইন গুলি সুরক্ষিত যা মৌলিক অধিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত I" all human beings are born free and equal in dignity and rights" মানব অধিকার হলো ব্যক্তির জীবন ,স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলো সংবিধান স্বীকৃত I অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি পত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কৃত্যক বলবংযোগ্য। মানব অধিকার অর্থ প্রকৃতি ও মানবাধিকার শব্দটির অর্থ নানাভাবে ব্যবহার করা যায় I শব্দগত অর্থে মানবাধিকার অর্থাৎ মানুষের সাধারণ জীবনযাপন ও সার্বিক ব্যক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অধিকার I কিন্তু বিগত উনিশ শতকে পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধ মানুষের ওপর অমানবিক ক্রিয়া-কলাপ হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন করতে বিপণ্ণ হয়ে উঠেছিল I সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবাধিকারের অর্থ হলো সাধারণ মানুষের ওপর রাষ্ট্রকৃত্যক

বেআইনি অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সাধারন মানুষের ন্যুনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুস্থ ভাবে জীবন যাপন করার স্বীকৃতি।

প্রকৃতি ও পরিধি:- মানবাধিকারের সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে এর প্রকৃতি করা প্রয়োজন।মানবাধিকারের দুটি দিক আছে একটি নেতিবাচক এবং অপরটি হল ইতিবাচক । নেতিবাচক দিক থেকে মানবাধিকার হলো সেই সব অধিকার কে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্র ' কখনো হস্তক্ষেপ করবে না। পৌর রাজনৈতিক অধিকার গুলি এই পর্যায়ভুক্ত। ইতিবাচক দিক থেকে মানব অধিকার হলো সেই সব অধিকার যে গুলির বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে । অর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার গুলি এই পর্যায়ভুক্ত। নেতিবাচক অধিকার গুলি বাস্তবায়ন করা সম্ভব তখনই যখন রাষ্ট্রসজ্যের ভূমিকা হবে গৌণ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেহারাটি হবে ক্ষুদ্রতম যাকে Robert Nozik বলেছে "ultra mini malist state", ইতিবাচক অধিকার গুলিকে বাস্তবায়ন করার জন্য রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেহারাটি হবে অতিকায়।

মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্ম পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সভার যুক্তির বিষয়টি ছিল নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মানবাধিকার বলতে আজ আর শুধু মানুষের ব্যক্তিগত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় বোঝায় না , একইসঙ্গে বোঝায় বিভিন্ন দেশ বা জাতির স্বাধীনতা অর্জন ও বিকাশের অধিকার।

১৯৪৮ সালে গৃহীত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিষয়ে ঘোষণাপত্রে মানবাধিকারকে বিশ্বজনীক অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে । বিশ্বের যেকোনো অংশে বসবাসকারী যে কোন স্তরের মানুষ এই অধিকার ভোগের উপযুক্ত । মানব অধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য এইসব অধিকারকে কেউ অন্যের হাতে তুলে দিতে পারেনা। আবার অন্য কেউ এই সব অধিকার কে ধ্বংস করতে বা নিতে পারেনা। প্রাকৃতিক অধিকার থেকে মানবাধিকার পর্যন্ত মানব ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় একজন ব্যক্তির সামাজিক অধিকার কর্তব্য এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট গ্রুপ এবং সংস্থায় পরিবার সম্প্রদায়। ধর্মীয় বর্ণ বা পেশাগত গোষ্ঠীর সাথে তার সদস্যদের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত , সার্বভৌম এবং অন্যান্য মানবাধিকার ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হলো মনুষ্য পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা অভিন্ন এবং অপরিহার্য মৌল অধিকার স্বীকৃত ও বিশ্ব শান্তির মূল ভিত্তি হলো স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার।

আলোচ্য ঘোষণায় 19 নং ধারায় বলা হয়েছে মানুষ সামাজিক জীব তাই সমাজের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের এবং প্রত্যেকটি মানুষের বিশেষ কর্তব্য আছে। কারণ মানুষের সমাজ এর মতইকারণ মানুষের সমাজের মধ্যেই প্রত্যেকটি মানুষ বেড়ে ওঠে এবং একমাত্র সমাজের মধ্যেএবং একমাত্র সমাজের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের সামাজিকএবং একমাত্র সমাজের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের সামাজিক-করন সম্ভব হয়। মানব অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ অনেকখানি ব্যর্থ কথা সত্য,এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জা কে আরো বেশি তৎপর হওয়া উচিত ছিল এটা ও ঠিক । কিন্তু মনে রাখতে হবে, জাতিপুঞ্জো হলো বিশ্ব বিবেক সীমাবদ্ধ সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জো যখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তার পিছনে বিশ্বজনমততার পিছনে বিশ্বজনমত এর সমর্থন থাকে সেই সিদ্ধান্ত কে উপেক্ষা করা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতি এর বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের যে পদক্ষেপ নেয় তা শেষ পর্যন্ত ওই দেশকে বর্ণ বৈষম্য নীতি অবশান ঘটাতে বাধ্য করে । এর পিছনে জাতিপুঞ্জের মানব অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি প্রভাব আছে বলে অনেকে দাবি।

-----XXX-----

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

তুসিনা খাতুন ও খুসবু কয়াল সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

ভূমিকা: মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন সহজাত অধিকারী হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে ও চর্চা করবে। তবেএই চর্চা অন্যের শান্তি সাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবেনা। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক, ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হলো এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের বিষয়টি এখন আরও প্রকট ভাবে অনুভূত হচ্ছে , এখন আমরা দেখছি যে, মানুষের অধিকার সমূহ আঞ্চলিক যুদ্ধ , সংঘাত, হানাহানির কারণে লংঘিত হচ্ছে । প্রথমত, একটি পরিবার ও সমাজের তাদের অধীনস্থদের অধিকার রক্ষা করবে , দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র, এবং তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দেশ্য: মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় । সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে বণিত এই অধিকারগুলি জাতি, জন্মস্থান,ধম্,বণ্ বিশ্বাস ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমানভাবে প্রযোজ্য এই অধিকার গুলি আদালতে বিচার যোগ্য । মানবাধিকারের মূল উদ্দেশ্য হলো মান পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা অভিন্ন অপরিহার্য অধিকারের স্বীকৃতি । মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র: হাজার ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে এই ঘোষণা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই সনদ ঘোষিত হয়। প্যারিসের বেলা ইজ দ্যা চেইলট নামক স্থানে এই ঘোষণা অনুষ্ঠিত।

জন পিটার্স হামফ্রে (কানাডা) , রেনে ক্যসিন (ফ্রান্স) , স্টিফানি হেঁসেল ফ্রান্স , চার্লস মালিক (লেবানন), পি.সি.চ্যাং চীন , এলিয়ানের রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আরো অনেক লেখকগণ মানবাধিকার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঘোষণার জন্য সম্মিলিত হন। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি। এই ঘোষনা সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের সাফল্যের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গ এ ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে শিক্ষার মাধ্যমে

এই স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং স্বাধীনতা সমূহের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি আদায় এবং যথাযথ পালন নিশ্চিন্ত করবে।

ধারা ১: সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে, সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব সুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

ধারা ২: এই ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহের গোত্র , ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি , জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোনও মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে । কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক , সীমানগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসির প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না, সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীন হোক, হোক অছিভুক্ত তার স্থায়িত্ব শাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা ৩: জীবন স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।

ধারা ৪: কাউকে ও অধীনতা বার দাসত্বের আবদ্ধ করা যাবে না । সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হবে। ধারা ৫: কাউকে নির্যাতন করা যাবে না , কিংবা কারোর প্রতি নির্চুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শান্তি দেওয়া যাবে না। ধারা ৬: আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। ধারা ৭: আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমান ভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষনা লংঘন করে এমন কোনো বৈষম্য বৈষম্য সৃষ্টি প্ররোচনার মুখে সমানভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে । ধারা ৮: শাসনতন্ত্রের বা আইনে প্রদন্ত মৌলিক অধিকার লজ্যনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। ধারা ১১: -১.দ্বন্দ যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম স্পর্শ সমর্থনে নিশ্চিন্ত অধিকার সম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইন অনুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে । ২. কাউকেই এমন কোন কাজ বা ক্রটির জন্য দগুযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না , যে কাজ বা ক্রটি সংঘঠনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল না । ধারা ১২: কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কিংবা তার গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল খুশিমত হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের ওপর আঘাত করা চলবে না । এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের

অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। ধারা ১৩:-১. নিজো রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে । ২. প্রত্যেকেরই নিজস্ব দেশ সহ যে কোন দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে । ধারা ১৪: নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্ন দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ১৫: কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ় কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না । ধারা ১৬:-১.ধর্ম গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণবয়স্ক নর-নারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে জীবনে এবং বিবাহ বিচ্ছেদে তাদের সমান অধিকার থাকবে | ২. বিয়েতে ইচ্ছুক নর-নারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে। ধারা ১৭: প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিত ভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে। ধারা ১৮: প্রত্যেকেরই ধর্ম বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে একান্তে, একা বা মিলিতভাবে শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা পালনের মাধ্যমে ধর্মবিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ধারা ১৯: প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মার্যাত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্তি ধারা ২০: প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে | ধারা ২১ প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ধারা ২২: সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার আছে। ধারা ২৩: প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরী বেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে । ধারা ২৪: প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে ় নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতন সহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত । ধারা ২৫: মাতৃত্ব এবং শৈশবাস্থয় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যতু এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহ -বন্ধন- বহির্ভূত কিংবা বিবাহ বন্ধন জাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা। ধারা ২৬: ১. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে অন্তত: পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। ২. কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে তা বেছে নেবার অধিকার পিতা-মাতার থাকবে । ধারা ২৭:- ১. প্রত্যেকেরই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক জীবনের

অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করার অধিকার রয়েছে । ২. বিজ্ঞান সাহিত্য ও শিল্পকলা ভিত্তিক কোন কর্মের রচয়িতা হিসেবে নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।

নীতি ও কর্তব্য: একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মানবাধিকার অন্যতম একটি বিষয় । জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশের গরীব , পিরীত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠে রাষ্ট্র নির্মাণকে দিশা দেখিয়েছে। ন্যায় এবং নীতির দিশা দেখিয়েছে এই মানবাধিকার।

মানবাধিকার রক্ষণ আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের জীবনে চিরকালই ব্যক্তির জীবনের সমতা ও সাম্যের সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে । প্রত্যেক মানুষের কাছে মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি নাগরিক যদি এই ঘোষণা মেনে চলে সচেতন হয় এবং সকলের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তবেই এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হতে পারে।

-----XXX-----

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের : মানবাধিকার রক্ষার পদ্ধতি সমুহ

সুমাইয়া পারভিন ও তারানুম খাতুন সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

জন্মগত ভাবে সকল মানুষ সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদার অধিকারী । এই অধিকার হল বিশেষ ধরনের এক নৈতিক অধিকার । মনুষ্যত্ত্বের দাবির প্রেক্ষিত থেকেই, এই অধিকার জন্মসূত্রে সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান । মানুবাধিকার হল সেই সমস্ত অধিকার যে গুলিছাড়া ব্যাক্তিতার

জীবন ধারন করতে পারবে না । যা স্বাভাবিক ভাবেই অর্জিত । ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে যাতে সকল মানুষের মানবিক অধিকার রক্ষিত হয় এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যর আত্ম মর্যাদাও অবিচ্ছেদ্য সমঅধিকারের স্বীকৃতি পায় । তাই মানবাধিকার হল বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির মূলমন্ত্র। এই মানবাধিকার রক্ষার ব্রত নিয়েই ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ওসামাজিক পরিষদের অধীন মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি কমিশন (UNHCR) গঠন করে। এর ঠিক দুই বছর পরে



১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভার তৃতীয় অধিবেশনে মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাটি গৃহীত হয় । যেখানে সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতির কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

রাষ্ট্রপুঞ্জ: মানবাধিকার রক্ষারপদ্ধতি সমুহ:

জাতিপুঞ্জ কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে এই মানবাধিকার রক্ষার কাজটি করে থাকে , যেমন-(১ প্রথাগত প্রতিরক্ষা পদ্ধতি , (২) অপ্রথাগত পদ্ধতি , (৩) মহাসচিবের কার্যালয়ের ক্ষমতাসমূহ। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনকানুন গুলির উপর সদা জাগ্রত দৃষ্টি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকে থামাতে ও অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ । এরূপ, বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান, সমিতি, গোষ্ঠী, নিয়মাবলি ও আইন কানুন গুলিকে সামগ্রিক ভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার রক্ষার পদ্ধতি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(১) প্রথাগত প্রতিরক্ষা পদ্ধতি:

প্রথাগত প্রতিরক্ষা পদ্ধতি অনুসারে চুক্তিদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির উদ্ভব হয়েছে । বহু অভিজ্ঞ ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত এই সমিতিগুলি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত আছে । মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুনের বাস্তব প্রয়োগকিভাবে সম্ভব , সেটার উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখাই হল এরূপ প্রতিষ্ঠান গুলির মূল উদ্দেশ্য। মানবাধিকার রক্ষায়রাষ্ট্রপুঞ্জ বিভিন্ন সমিতি গঠন করেছে। যেমন, (১) সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি (The Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) (২) মানবাধিকার কমিটি (The Human Rights) (৩) নারীদের ওপর সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরনের জন্য কমিটি (The Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). (৪) শিশুদের অধিকার বিষয়ক কমিটি (The Committee on the Rights of the Child). (৫) নিপীড়ন ও অন্যান্য অমানবিক এবং অবমাননাকর আচরণ বা শান্তি নিবারণ বিষয়ক কমিটি (The Committee against Torture). (৬) অভিবাসনকারী শ্রমিকদের বিষয়ক কমিটি (The Committee of Migrant Workers). (৭) প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার বিষয় কমিটি। (The Committee on person with Disabilities).

(২) অপ্রথাগত পদ্ধতি: প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত চুক্তি সমিতি পদ্ধতি ছাড়াও রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার রক্ষার্থে অপ্রথাগত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতি অনুসারে , রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার রক্ষার জন্য বহু প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী গ্রহণ করেছে। নিয়মাবলী গুলো হল (১) অভ্যন্তরীণ ভাবে স্থানচূত ব্যক্তিদের জন্য মহাসচিব দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি দল। (২) পরিকল্পিত ও বলপূর্বক বিলোপসাধন এবং বিনা বিচারে আটক বন্দিদের উদ্দেশ্য কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী গঠন। Working Groups on Enforced on Involuntary Disappearances and on AR binary Deletion). (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা নিযুক্ত একটি বিশেষ পদ হল বিশেষ প্রতিবেদক । এরূপ বিশেষ প্রতিবেদক মানবাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়গুলির উপর পর্যবেক্ষণ করেন। যেমন- বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও অপক্ষপাত, অত্যাচার ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বর্ণ বিদ্বেষ ও বৈষম্য, মহিলাদের প্রতি অত্যাচার ও বৈষম্য।

(৩) মহাসচিবের কার্যালয়ের ক্ষমতা সমূহ : রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তার কার্যালয়ের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রচার ও প্রতিরক্ষা নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করে থাকে। মহাসচিবের কার্যালয়যে বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখে সেগুলি হল, আটক ব্যাক্তিদের ছাড়ানো, মৃতুদন্ড এর বিলুপ্তি ইত্যাদি।

মানবাধিকার রক্ষার্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এর ভুমিকাঃ

এই পরিষদ এর মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার দুটি নিয়মাবলির উদ্ভব ঘটেছে -প্রথমটি ১২৭৫ ও দিতীয়টি ১৫০৩ নিয়মাবলি নামে পরিচিত। এই প্রকার পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল , মানবাধিকার লজ্মন সংক্রান্ত ঘটনাগুলির বিচার বিবেচনা করা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত থাকা। এছাড়াও রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার রক্ষারক্ষেত্রে পরামর্শ দানমূলক ব্যবস্থা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই পরামর্শদান সংক্রান্ত ব্যবস্থার সূচনা ঘটে ১৯৫৫ সালে। যার মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রপুঞ্জ এর বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রগুলি মানবাধিকার রক্ষার্থে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়।

এর তিন দশক এর শেষের দিকে ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সচিবমানবাধিকার রক্ষার্থে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে "স্বেচ্ছাকৃত তহবিল" এর সূচনা করেন। মানবাধিকার রক্ষার্থে, রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার কেন্দ্র (UN Human Rights Center) ও নির্বাচনে সাহায্যকারী বিভাগ (Electoral Assistance Division) বিভিন্ন সময়ে নানান বিষয়ে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করেছে। এধরনের কয়েকটি বিষয়হল-(১) জাতীয় আইন প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে দিয়ে মানবাধিকারের ধ্যানধারণ কে তুলে ধরার জন্য জাতীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। (২) জাতীয় আইনের সংশোধন: রাষ্ট্রীয় জাতীয় সংবিধান হল মানবাধিকার ভিত্তি প্রস্তর। নতুন আইন সংবিধানে তৈরি করার কায়ে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে সংবিধান প্রনয়নেরমধ্য দিয়ে মানবাধিকারের বিভিন্ন আদর্শ প্রকাশ প্রয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত অপর রক্ষাকবজটি হল উচ্চ কমিশন। ১৯৯৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর সাধারণসভাসর্বসম্মতিক্রমে উচ্চকমিশনের পদ (UN High Commissioner for Human Rights) গঠিত হয়। এই পদাধিকারীকে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রহরী বা (watch dog) বলা হয়। উচ্চকমিশন সাধারণ সচিবের সঙ্গে সহযোগিতার করে ও মানবাধিকার রক্ষার্থে 'এই কার্যালয়' পরিচালনা করে থাকেন। বলা যায়, রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার রক্ষা এবং প্রচারের উদ্দেশ্য বহু ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টা গ্রহন করে চলেছে। মানবাধিকার বিষয়ে বিশিষ্ট লেখক লুই হেনকিন

এর গ্রন্থ 'The United Nations and Human Rights-'এর ২১তম অধ্যায়ের , ২১নং পাঠ অনুসারে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজকর্ম বর্ণনা করে বলেছেন: "ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে , প্রত্যাশা বেশি অর্জন করেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশার অনেক কমই অর্জন করেছে"

-----XXX-----

মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগ সাফল্য ও ব্যর্থতা

অলিপ্রিয়া পাল ও সায়ক চক্রবর্তী সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন , সহজাত, অহস্তান্তর এবং অলজ্ঘনীয় অধিকারই হল মানবাধিকার। মানব সভ্যতার ইতিহাস মানুষের জীবন ও তার মর্যাদার প্রতি অসম্মানের ঘটায় পূর্ন। একাদশ শতান্দী থেকে মানবাধিকার লজ্ঘন হচ্ছে এবং তা বর্তমানেও পরিস্থিতি পরিমন্ডলের তেমন খুব কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বিংশ শতান্দীর প্রথমার্ধে মানবসভ্যতার ইতিহাস ইতিহাসে দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যা মানবাধিকার লজ্মনের এক প্রতীক চিহ্ন বলা যেতে পারে। মানবজাতি মানবতাবিরোধী উৎস লীলা প্রত্যক্ষ করেছে। এবং বারে বারে তাদের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার সমূহ পদদলিত হয়েছে। বারে বারে মানবাধিকার লজ্মন দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলেই কিন্তু মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি উঠে এসেছে। এবং ওই মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাম প্রথমেই এসে পড়ে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে' সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানবাধিকার রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগ :-

জাতিপুঞ্জের মূল লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। আর এই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মানবাধিকারের স্বীকৃতি একান্তভাবে প্রয়োজন। তবে স্বীকৃতি দিয়েই জাতিপুঞ্জ তার দায়িত্ব একেবারে শেষ করে দেয়নি। জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য ও অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগ গুলির মধ্যে কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করা আছে।

সেগুলি হলো-[ক] মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন সংগঠন , [খ] মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপএ, [গ] আন্তর্জাতিক চুক্তি, [ঘ] মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব-সম্মেলন , [ঙ]তথ্যানুসন্ধান ও দায়িত্ব পালন।

[ক] মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন সংগঠন:- মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব জাতিপুঞ্জের সবকটি বিভাগের উপর থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি কার্য কমিশন রূপে মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন গঠন হয়। এর সদর দপ্তর জেনেভায় অবস্থিত।

এই কমিশন-এর মূল উদ্দেশ্য হলো -(১) মানুষের মৌলিক অধিকার গুলিকে আরও বেশি মর্যাদা প্রদান। (২) মানবাধিকার লজ্যনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত। (৩) মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন বিভিন্ন ঘোষনা এবং (৪) সম্মেলন আহ্বান ,সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের আহ্বান এবং তাদের সংরক্ষণ। মানবাধিকার কমিশন সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য মানবাধিকারের একটি সাধারণ সাব কমিশন গঠন করে। এই সাব কমিশন সংখ্যালঘুদের শিক্ষা , ধর্মীয় অধিকার ও নীতি রূপায়নে বৈষম্য মূলক আচরন নিয়ন্ত্রণে নানা রকম সমীক্ষা চালিয়েছেন।

খি] মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষনা পএ:- মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিপুঞ্জের সকল উদ্যোগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগিট হলো সার্বজনীন ঘোষনাপএ প্রনয়ন। প্রায় আড়াই বছর পরিশ্রম এরপর মানবাধিকার সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তুত করা যায়। ঘোষনাটি ১৯৪৮ সালে সাধারন পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। ওই বছর ১০ ডিসেম্বর সাধারণ প্রস্তাব ওই অনুমোদন গ্রহন করে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে ৩০ টি ধারায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পএ বিশ্বের বিশ্বের বিভিন্ন কোনের মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে বহু দেশের সংবিধানের উপর এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণা পএ ছাড়াও জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত আরও কয়েকটি ঘোষনাপএ গ্রহন করেছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- (১) শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষনাপএ (১৯৫৯ / ১৯৯১), (২) উপনিবেশ ও তাদের জনসাধারণের স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ঘোষনাপএ (১৯৬০),

- (৩) নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসান সম্পর্কিত ঘোষণা পএ (১৯৬৭) , (৪) অত্যাচার ও শাস্তিদান থেকে সকল মানুষের সুরক্ষা সংক্রান্ত ঘোষনাপএ (১৯৭৪), (৫) ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সর্ব প্রকার বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত ঘোষণা পএ।
- (গ) আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন:- মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপএ উল্লেখিত বিষয়সমূহের সুষ্ঠ রূপায়নের দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। (১) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (২) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বলিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এই চুক্তিদ্বয় মেনে চলার জন্য রাষ্ট্রীয় কথাগুলির উপর বাধ্যতামূলক আরোপ করে জাতিপুঞ্জ সনদের বিধানগুলিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রবর্গ ওই চুক্তিদ্বয়ের সাথে যুক্ত রেয়েছে। ওই দুট্তি জাতিপুঞ্জের সনদের সাথে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক বিল অফ রাইটস হিসাবে পরিচিত

লাভ করেছে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার সম্পর্কিত অসংখ্য ঘোষনা সম্পাদিত হয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ হলো - (১) গনহত্যার শাস্তিবিষয়ক কনভিনশন (১৯৪৮) , (২) বৈষম্যের বিলোপসাধন-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন,

- (৩) উদ্বাস্তদের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (১৯৬১) প্রভৃতি।
- (ঘ) মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন:-

মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন হলো বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার পর্যালোচনার প্রথম সম্মেলন।
১৯৯৩ সালের ১৪-২৫ জুন ভিয়েনায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন গ্রহন করা হয় এবং তা ভিয়েনা সম্মেলনে পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রতিবন্ধী ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করা হয়। ভিয়েনা ঘোষনায় উল্লেখ করা হয় যে গনতন্ত্র , উন্নয়ন, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মৌলিক অধিকার পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

(ঙ) তথ্যানুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ:-

উপরিক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও জাতিপুঞ্জ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানবাধিকার লজ্যনের ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করেছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লজ্যনের অভিযোগের ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা করেছে। এবং যেসব মানবাধিকার রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেনি তাদের ধিক্কার জানিয়েছে। মানবাধিকার লজ্যনের কোনো ঘটনা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী হলে

নিরাপত্তা পরিষদ নিজ হাতে হস্তক্ষেপ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবৈষম্য কারনে , ইজরায়েল প্যালিস্তীয় মানুষের উপর অত্যাচার- এর জন্য জাতিপুঞ্জের মঞ্চে বারবার বিয়ষটি নিয়ে গেছেন। এছাড়া মানবাধিকার লজ্ঘনের জন্য মায়ানমার, আফগানিস্তান, সার্বিয়া বারবার মনোনীত হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সাফল্য

(১) দ্রুত সাফল্যের কিছু মূল দিকগুলি:- উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে তোমার জন্য 'মানবাধিকার' বিষয়টি অন্তত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক আগে থেকেই মানবাধিকার এর বিষয়টিকে লক্ষ করে এবং এটিকে রক্ষা করার জন্য বড় তিনটি এমন সংস্থাও আছে যেমন , (১) অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, (২) যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও (৩) বাংলাদেশ মানবাধিকার সংগঠন আইন।

মানবাধিকার সংক্রান্ত কিছু মূল সাফল্যের মধ্যে পড়ে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার ঘোষনাপএ আইন পাশ হয়। ঘোষণাপত্রে মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে -মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং এটাই অভিন্ন ও অধিকারের স্বীকৃতি হল স্বাধীনতা , ন্যায় বিচার এবং এটাই বিশ্ব শান্তির মূল ভিত্তি।

- (২) মানব জাতির স্বার্থে মানবাধিকার:- মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা পএ গুলি গুলি মানব জাতির স্বার্থে তৈরি এখানে সবাই সমাজ অধিকার পেয়েছে এবং মানবাধিকার ক্ষমতা দখলের জন্য একটি জাতিকে কোনো নির্দিষ্ট কারন ছাড়াই আঘাত করতে পারে না এবং কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতি হলে দেশে আইন আছে তার সাহায্য নিতে পারেন । তবে মানবাধিকার কখনোই পরস্পরে লড়াই এবং সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা সমর্থন করেন না।
- (৩) মানবাধিকারের সফল মানব জাতি:- মানবাধিকার নিরপেক্ষ হতেই হয় এবং মানুষের নিজেকে যত বদলাবে এবং নিজের জীবনকে উন্নত করে তুলবে মানবাধিকার ততই সফল হবে। মানুষ দ্বারা মানবাধিকার লজ্ফন হলে জাতির কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এবং স্ত্রী জাতির উপর অত্যাচার, সংখ্যালঘুদের উপর নিজের রাজত্ব জমানো মানুষের মৌলিক অধিকার করে নেওয়া মানুষের করণীয় নয়। মানুষ উন্নত জীব এবং মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়ানো সব ধর্মের এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এটাই মানবাধিকারের মূল দিক এবং মানুষ তা রক্ষা করে এবং করে চলেছে ভবিষ্যতেও করবে।

কোন একটি বিশেষ যেমন সাফল্য থাকে বিপরীত দিকে তেমনই ব্যর্থতা থাকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং তার ব্যর্থতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নীচে আলোচনা করে দেওয়া হলো-

মানবাধিকার সংক্রান্ত ক্রটি সমূহ :- প্রথমত, মানবাধিকার লজ্ঘনের সময় থেকে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ পেশ করার যে সময়সীমা দেওয়া আছে তা ভারতের মতো নিরক্ষর দেশে ভিত্তিহীন হয়ে পরে ও সামাজিক বন্ধনের দেশে এই সীমাবদ্ধ উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, এই ক্রুটির জন্যই সময় সময় ও পদ্ধতিগত কারনে কমিশন অনেক বড় বড় অভিযোগ সময় পেরিয়ে গেলে বাদের খাতায় করে দেন ফলে আদতেই কোনো ফল মেনে না।

তৃতীয়ত, একটি দেওয়ানি আদালতের মতোই কমিশন কার্য পরিচলনা করে থাকে এবং সেই মর্যাদাও ভোগ করে।

চতুর্থত, আমাদের বিভিন্ন দেশে অনেক বড় বড় অভিযোগেই দেখা যায় শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের শাস্তি পেতে দেরি হয় এতে অভিযোগকারী পরিবারের মানুসিক পরিস্থিতিও খারাপ হতে পারে কারন তারা নিশ্চয়ই চাইবে অপরাধীদের জলদি সাজা হোক নিরপেক্ষভাবে কাজ হোক তাড়াতাড়ি।

পঞ্চমত, শুধুমাত্র খাতা ও কলমে মানবাধিকার নয় সেটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।
মানবাধিকার আসলে কি এবং এটি লজ্ঘনের ফল সরকারের প্রয়োজন এটির উপর গুরুত্ব দেওয়া
আমাদের দেশে বেশি করে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হোক বিষয়টি গুরুত্ব।

ষষ্ঠমত, আমাদের দেশ ভারতের নানা ভাবেই দেখা যায় যে কোথাও মানবাধিকার লজ্যন হলে নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বিষয়টি লুকানোর চেষ্টা করে সাধারণ মানুষের থেকে।

তাহলে যেখানে মানবাধিকার লজ্ঘন হচ্ছে দেশের সরকার লুকানোর চেষ্টা করছে সেই সরকার আবার মানবাধিকার নিয়ে প্রচার করবে এতে কি সত্যিই মানুষের বিশ্বাস উঠে যায় সেই যায় উপর এতে সরকার নানা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

-মানবাধিকার লজ্যনের 'দুইটি' ঘটনা নীচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো-

[১] আমেরিকা:- ২০২০সালের ২৫মে , কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করা হয় বলে আমেরিকার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে আসে। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনে এক কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু মৃত্যু নাডিয়ে দিয়েছিল ট্রাম্প সরকারকে। অভিযোগ উঠে আসে যে ক্রমাগত ঘাডে ও পিঠে সংকোচনের

কারনে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যান। অনুমাকিন হিসাব অনুযায়ী আমেরিকায় প্রতিবছর পুলিশের হাতে মারা যায় ১,২০০ জন ব্যক্তি। কিন্তু ৯৯ শতাংশ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় না। যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে 'মানবাধিকার' কথাটি হেরে যায়। আমেরিকায় বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ৪০টির বেশি শহরেও কার্ফু জারি হয়। আট মিনিটের উপরে হাঁটুর চাপে শ্বাসরোধ রোধে মৃত্যু হয় জর্জ এর। পুলিশ অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে হাঁটুর চাঁপ দিয়ে জর্জ হত্যার জন্য থার্ড ডিগ্রি মার্ডার ছাড়াও নর হত্যার অভিযোগে দায়ের করা হয়। বাকি দুই অফিসারকে বরখাস্ত করা হয় চাকড়ি থেকে।

[২] ভারত:- বুধবার (নভেম্বর ২৭ , ২০১৯) এই মানবাধিকার লজ্যনের ঘটনাটি সারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের কাছে একটি চাঁপ রেখে গেছিল। হায়দ্রাবাদের শামস বাদে ২৬ বছরের একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায়। খুবই খারাপভাবে মানুসিক অত্যাচার করা হয় তার উপর এবং মানবাধিকার লজ্যন করা হয়। ঘটনা থেকে যা যায়, তিতি তার স্কুটি শাদনগর টোল প্লালা শামসাবাদ পার্ক করে গেলেন এসে দেখে চাঁকা পাঞ্চার হইয়া আছে। তার বোন বোন দিদি আসছেনা দেখে ফোন করে তখন সে বলেন কি হয়েছে। তারপর ওখানে কিছু ছেলে তাকে সাহায়্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও তাদের মনে খুব খারাপ কিছু চলছিল যা মেয়েটি বুঝতে পারেনি তার উপর অত্যাচার করা হয় তার মৃত দেশ পাওয়া যায় হায়দ্রাবাদ ও বেঙ্গালোর মহাসড়কে। পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং ফাঁসি দেওয়া হয়।

-----XXXX

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

সারিকা খাতুন ও সুমাইয়া পারভীন সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

ভূমিকা:- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা । এই স্বেচ্ছাসেরী সংস্থাটি এক ব্রিটিশ আইনজীরী পিটার বেনেনসন ১৯৬১ সালে আমেরিকা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। এই সংগঠনের প্রথম মহাসচিব ছিলেন অ্যাগনেস ক্যালামার্ড। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে মাদারীপুর গ্রুপ , ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজ্যের গ্রুপ এবং ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে কালকিনি গ্রপ ঢাকায় স্বীকৃতি লাভ করে । প্রধানত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংগঠন একটি বৈদেশিক সংস্থা । এই সংস্থাটি কোন বিচার বিবেচনা ছাড়া বন্ধি ব্যক্তিদের মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত করত এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করা ও সাধারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এটি বিশেষত নারীদের প্রতিকার্যকর। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ের উত্তরন ও মর্যাদা রক্ষার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষনাপএ বাস্তবায়নে সংস্থাটি একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত এর একটি নীতিবাক্য ও রয়েছে সেটি হল 'অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে একটি মোমবাতি জ্বালানো উওম'।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গঠন:- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর আন্তর্জাতিক সচিবালয় ১৯৮৫ সালের ২৮ জুন এই ঢাকা গ্রুপকে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু গ্রুপ গড়ে ওঠে এবং এদের মধ্যে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে মাদারীপুর গ্রুপ, ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজৈর

গ্রুপ এবং ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে কালকিনি গ্রুপ স্বীকৃতি লাভ করে । বর্তমানে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ অংশে প্রায় ৪০টি স্থানীয় ও পেশাজীবী গ্রুপে সর্বমোট সহস্রাধিক সদস্য রয়েছেন। ১৯৯২ সালের ২৮

AMNESTY INTERNATIONAL



আগস্ট ঢাকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখার প্রথম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাহী কমিটি গঠিত হয় । একজন সার্বক্ষণিক পরিচালক বাংলাদেশ শাখার দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। ঢাকার কমলাপুরে কবি জসীমউদ্দীন রোডের ২৮ নং বাড়িতে সংস্থার দপ্তর অবস্থিত।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কার্যাবলী:- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখা মানবাধিকার লজ্মন রোধের কৌশলের ওপর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লজ্মন রোধের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সভা, সেমিনার ও শোভাযাত্রা ইত্যাদির ও আয়োজন করে। এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস , ১ মে দিবস এবং ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন করে থাকে। ভিন্ন মতাদর্শী হিসেবে আটককৃতদের আশু ও নিঃশর্ত মুক্তি, রাজবন্দিদের স্বচ্ছ ও দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন, সব ধরনের উৎপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান এবং মৃত্যুদণ্ড রহিত করণের জন্য এই সংগঠন কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লঙ্মনের ঘটনা সম্বলিত তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করে এবং এই করে এ ধরনের লঙ্মনের ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য জনগণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে । এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নিয়মিত বুলেটিন, প্রচারপত্র ও পোস্টার প্রকাশ করছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্দেশ্য:- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রধান কতগুলো বিষয়াবলীকে ঘিরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে -

- ১. নারী , শিশু, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা করা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান উদ্দেশ্য।
- ২. নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা । ৩.বিচার ব্যবস্থায় নির্যাতন বন্ধ ও যুদ্ধভীতি বন্ধে সহায়তাকরণ
- ৪.দারিদ্যের শিকার পর্যদুস্ত ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা প্রাপ্তিতে সহায়তা করণ
- ৫.মৃত্যুদণ্ডাদেশ আদেশ রোধ করা।
- ৬.যাযাবর ও শরণার্থীদের অধিকার রক্ষাকরণ
- ৭.ন্যায় বিচারের স্বার্থে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা।

৮.মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। ৯.বৈশ্বিক পর্যায়ে অস্ত্র ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাফল্য:- অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থাটি ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন এবং তার ঠিক ১ বছর পর ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার লাভ করেন। এই সংস্থাটি নারী নির্যাতন বন্ধ করতে সক্ষম হয়। এই সংগঠনের উন্নতির জন্য আরো নানা দেশের স্বীকৃতি সাফল্য লাভ করে । বর্তমানে অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংগঠনটি বাংলাদেশের প্রায় ৪০ টি অংশে স্থানীয় পেশাজীবী গ্রপে সর্বমোট সাম্প্রদায়িক সদস্য রয়েছে।

-----XXX-----

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

সারিকা খাতুন, সুমাইয়া পারভীন ও নেহা নাসরিন, সেমিস্টার-২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

ভূমিকা:- হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেসরকারি ও অ-লাভজনক একটি সংস্থা যা মানবাধিকার বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করে আসছে । এই সংস্থাটির প্রধান কাজ হল মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা , পরামর্শ ও সমর্থন প্রদান করা । এই সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় বা সদর দপ্তরটি উপস্থিত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে । হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হল বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম । এই সংস্থাটির সমস্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে । তাই ক্ষমতাশালী সরকার এই সমস্ত প্রতিবেদন গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। কারণ জনসাধারণের মধ্যে

এই সমস্ত প্রতিবেদন বিশ্বাস যোগ্যতার মান ও মাত্রা বেশ অধিক উল্লেখযোগ্য । মানবাধিকার বিশ্বব্যাপী প্রচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO). যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০১৮-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের অধিকার হ্রাসের বিপরীতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। প্রতি বছর এ সংগঠনের উদ্যোগে হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় সংক্রান্ত বিষয়ে পথ-প্রদর্শক এবং সাহসী ভূমিকার অধিকারী ব্যক্তিত্বকে এ পদক দেয়া হয় । পদক বিজয়ী ব্যক্তি পরবর্তীকালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন । এসব সংগঠন সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক এনজিও হঠাৎ করে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থার গ্রহণ যোগ্যতা নিয়ে বেশ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আসছে । জুন, ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী সংস্থাটির বার্ষিক ব্যয় সর্বমোট \$৫০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ওপেন সোসাইটি ইন্সটিটিউটের সভাপতি জর্জ সোরোজ হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রধান দাতাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত । তারা সংস্থাটির মোট বাজেট \$১২৮ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে \$১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দান করে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তারা এ দান আগামী দশ বছরে বার্ষিক \$১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসেবে বার্ষিকী আকারে প্রদান করবে।

গঠন:- ১৯৭৮ সালে একটি বেসরকারী আমেরিকান প্রতিষ্ঠান হিসেবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে এর নাম ছিল হেলসিংকি ওয়াচ । হেলসিংকি সম্মেলন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সংঘটিত গুরুতর অভিযোগ সমূহ তদারকি করার বিষয়ে হেলসিংকি ওয়াচের জন্ম হয় । আমেরিকাস ওয়াচ মধ্য আমেরিকায় রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ১৯৮১ সালে গঠন করা হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও কাজ করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ভঙ্গ করেছে তা নয়; সরকারের পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধী বিদ্রোহী দলগুলোও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ভঙ্গ করেছে। এশিয়া ওয়াচ (১৯৮৫) , আফ্রিকা ওয়াচ (১৯৮৮) এবং মিডল ইষ্ট ওয়াচ (১৯৮৯) একীভূত হয়ে 'দি ওয়াচ কমিটি ' নামে পরিচিত। ১৯৮৮ সালের সকল কমিটি একত্রিত হয়ে পরবর্তীকালে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' নামে পরিচিতি পেয়েছে।

কর্মকাণ্ড:- হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নির্যাতিত-নিপীড়িত লেখকদের রক্ষার্থে তাদের লিখিত প্রবন্ধ-রচনাগুলো প্রকাশের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করেছিল। প্রতি বছর এ সংগঠনের উদ্যোগে হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় । মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে পথ-প্রদর্শক এবং সাহসী ভূমিকার অধিকারী ব্যক্তিত্বকে এ পদক দেয়া হয় । পদক বিজয়ী ব্যক্তি পরবর্তীকালে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের সাথে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন । প্রতি বছর হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৯০ টি দেশে মানবাধিকার সম্পর্কিত ১০০ টিরও বেশি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে এবং পর্যায়ক্রমে সদস্য দেশগুলোর সরকার, জাতিসংঘ এবং ইউনিয়নের সাথে বৈঠক করেন।

কার্যালয়:- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়াও, বিশ্বের অনেক স্থানে এর শাখা রয়েছে । তন্মধ্যে–বার্লিন, বৈরুত, ব্রাসেলস, শিকাগো, জেনেভা, জোহানেসবার্গ, লন্ডন, লস এঞ্জেলেস, মস্কো, প্যারিস, স্যান ফ্রান্সিসকো, টোকিও, টরেন্টো এবং ওয়াশিংটন অন্যতম । ১৯৯৩ সাল থেকে কেনেথ রথ হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৮১ সালে পোল্যান্ড সামরিক আইন জারি ঘোষণার পর তদন্ত কার্য পরিচালনা করেছিলেন। তারপর তিনি হাইতির দিকে দৃষ্টি দেন।

সাফল্য:-[১] কোনো দেশের নাগরিকরা যখন তাদের প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেন, কেবল তখনই সে দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতিকে ভালো বলা যায় । অস্বীকার করার উপায় নেই, ২০১৭ সালে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক।

[২] মানবাধিকারের প্রধান দুটি অধ্যায়ের একটি অর্থাৎ অর্থনৈতিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু হার ও দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়াসহ ' ৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, দেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানসহ অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক বেশকিছু আইন প্রণয়নের কথা বলা যায়।

ব্যর্থতা:-[১] বিশ্বের ৯০টিরও বেশি দেশে ২০১৭ সালের মানবাধিকার ও অধিকার অনুশীলনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা শেষে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে । প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অধ্যায়ে গোপনে গ্রেফতার, শুম-খুন, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর জড়িত থাকার বিষয়টি তুলে ধরে বলা হয়েছে , শুরুতর মানবাধিকার লজ্ঘনের এসব ঘটনায় সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে জবাবদিহির আওতায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

[২] প্রতিবেদনে বিরোধী মত ও সমালোচনা দমন করতে আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার , সুশীল সমাজ ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা ইত্যাদি ছাড়াও নারী অধিকার ও শ্রমিক অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটা পিছিয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছ।



মানবাধিকার ও ভারত

ভারত ও মানবাধিকার

খালেদা খাতুন , সেখ নাগিন, কাকলি মন্ডল ও আনিসা খাতুন সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এর সূচনা বলা যেতে পারে।ভারত সরকারের মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন অনুসারে "মানবাধিকার হল ব্যাক্তির জীবন , স্বাধিনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত"।

1993 সালে মানবাধিকার আইন ও জাতীয় কমিশন গঠন করা হলে ও মানবাধিকার বিষয়ে ভারতের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। 1895 সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব তৈরি। অবশেষে 1931 সালে জাতীয় কংগ্রেস মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহন করে।

মানবাধিকার বিশ্বব্যাপি প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সিম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO)। জাতিপুঞ্জের উদ্যোগেই প্রথম 1948 সালের 10 ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় "মানবাধিকারের ঘোষণা পত্র বিনা বিরোধীতায় গৃহীত হয়"। ভারত অনেক ব্যাপারে বিশ্বের উন্নত দেশ গুলির থেকে পিছিয়ে থাকলে ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে থেকেই অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে।

মানবাধিকার কি:- মানবাধিকারের ধারণা স্বাভাবিক অধিকারের নীতির সমতূল্য প্রাচী।মানবাধিকারের সজ্যায় তাই বলা যেতে পারে মানবাধিকার হল সেই সকল অধিকার যা ব্যতীত জীবন ধারণ সম্ভব নয়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই রাষ্ট্র দ্বারা প্রাপ্ত অধিকার ভোগ করবে। সুতরাং মানবাধিকার বলতে সেই সকল অধিকার বোঝায় যা প্রতিটি ব্যক্তি কেবল তার মানবজন্মের সুবাদেই রাষ্ট্র অথবা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অন্যথায় মানবাধিকার হল প্রতিটি ব্যক্তির জীবন , স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যদা জনিত অধিকার। মানবাধিকার সুরক্ষা আজ সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক প্রাধান্য পাচ্ছে।

মানবাধিকার রক্ষার আইন:- স্বাধীনতার পরেই ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনায় এবং সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের তালিকায় মানবাধিকার কে সংযুক্ত করা হয়েছে। 1993 সালে অর্ডিন্যান্স করে মানবাধিকার আইন (The protection of human rights act 1993) চালু করা হয়।

ভারতের মানবাধিকার শুধু স্বীকার করে তা নয় মর্যাদা ও দেয়। স্বাধীনতার পর প্রজাতন্ত্রী ভারত তার সংবিধানে লিখিত আকারে মানবাধিকার সংযুক্ত করেছে।সংবিধানের প্রস্তাবনায় , নির্দেশমূলক নীতিতে, নাগরিকদের সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের বিভিন্ন ধারায় মানবাধিকারের বিভিন্ন অধিকার ও স্বধীনতা স্থান পেয়েছে।

প্রস্তাবনায়:- ভারতের সংবিধানে প্রথমেই প্রস্তাবনায় মানবাধিকারের আদর্শ নীতি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবনা বর্তমানে যে ভাবে আছে নিম্নে তা তুলে ধরা হয়েছে। "আমরা ভারতের জনগন ভারত কে সার্বভৌম সমাজ তান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক, স্বাধারন তন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা , সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যে নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহন করে। আমাদের গণ-পরিষদে আজ 1949 সালের ৪6 নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহন, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন করছি।

মৌলিক অধিকার:- ভারতের সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ন, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকার গুলি সংবিধানে সংরক্ষিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার বলতে যে সব সুযোগ সুবিধা বা অধিকার গুলিকে বোঝায় তার প্রায় অধিকাংশই মৌলিক, শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার প্রভৃতি মানবাধিকার অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে রচিত হয়েছে।

নির্দেশ মূলক নীতি:- ভারতের মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালকদের প্রতি এই নির্দেশ গুলি দেওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধানের 36 নং ধারা থেকে 51 নং ধারায় নির্দেশমূলক নীতি গুলি বর্নিত হয়েছে। বর্তমানে এতে 17 টি নীতি আছে।আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরনে এই অধ্যায়টি রচিত হলেও নীতিগুলির ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরুর

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা (1948) নির্দেশমূলক নীতি রচনাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল।

অন্যান্য মানবাধিকার পদক্ষেপ প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি এই তিনটি ছাড়াও বিভিন্ন সাংবিধানিক পদক্ষেপের মাধ্যমেও ভারতের মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন -32 নং ধারা ও 226 নং ধারা। এই দুই ধারার মাধ্যমে হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট রিট জারি করতে পারে। এর মধ্যে বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ নীতি, পরমাদেশ, অধিকার পূচ্ছা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কমিশন গঠনের মাধ্যম নিমানবাধিকার রক্ষার জন্য ভারত রাষ্ট্রীয় ভাবে যেমন বিভিন্ন রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে; যেমন -তপশিলি জাতি , উপজাতি কমিশন , সংঘ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন , জাতীয় মহিলা কমিশন এবং সবশেষে গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (1993)।

জঙ্গি সমস্যা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থার নামে সরকার মানবাধিকার লজ্যন করছে এটা যেমন সত্য তেমন সন্ত্রাসবাদী ও ধর্মীয় মৌলবাদীরাও শিশু, নারী সহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে সেটা ভারতের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। এই বিষয়ে ভারত সরকার যথাসাধ্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে। কিন্তু কিছু বিদেশি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদতে এই মানবাধিকার বিরোধী নির্মূল করা যাবেনা।

আদালত ও জনমতের ভূমিকা ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট অনেক সময় সরকারের বহু অন্যায় আদেশ ও আইনকে আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে।উদাহরণ স্বরূপ সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক অভ্যান্তরীন নিরাপত্তা আইন অর্থাৎ "মিসার" 17 (ক) ধারাটি বাতিলের কথা বলা যায় ; তা ছাড়াও জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা গ্রহন করে ও হাইকোর্ট গুলি একটা বড় মানবিক ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম:- বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মানবাধিকার রক্ষার প্রশংসীয় ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সংবাদমাধ্যম। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, চলচ্চিত্র,রেডিও প্রভৃতি ভারতের মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা যেভাবে তুলে ধরেছে তা প্রশংসনীয়। মানবাধিকার রক্ষার প্রতিবন্ধিকতা:- (ক) ভারতের মানবাধিকার আজ ও সুরক্ষিত নয়।ভারতে মানবাধিকার রক্ষার পথে প্রধান বাধা হল তীব্র ধন বৈষম্য ও দারিদ্রতা।দেশের বহু মানুষ এখনো দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। বহু মানুষ অনাহারে মারা যায়। তাদের জন্য অন্ন, আশ্রয়, চিকিৎসা ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে মানবাধিকার রক্ষা সম্ভব নয় (খ) সামাজিক কাঠামোরত দিক থেকে ও বাধা রয়েছে।সমাজের বর্ণভেদ প্রথা , শিক্ষার অভাব , সচেতনতার অভাব ,দমনপীড়ন, মানুষের মানবাধিকার। ক্ষুন্ন করেছে। পণপ্রথা , বাল্যবিবাহ,কন্যা সন্তানকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করা নারীর মানবাধিকার বিরোধী। (গ) বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম মানবাধিকার লজ্যন করছে। (ঘ) পুলিশের দুর্ব্যবহার নিরাপত্তা কর্মীদের দমনপীড়ন মানবাধিকার লজ্যন করছে। (ছ) সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি মানবাধিকার বিরোধী। (চ) নির্বাচনকে ঘিরে হিংসা ও দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয় তার ফলে ও মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে । (ছ) সবশেষে বলা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার বিশেষ অভাব।

মূল্যায়ন:- তবে উপরিক্ত সমালোচনা বা মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ঐসব বাধা থাকার সত্বেও ভারতে মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে মোটামুটি সব ব্যবস্থা আছে। এমনকি রিট আবেদন সংক্রান্ত যেসব বাধার কথা বলা হল তাও অনেকটা দূর করতে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে ভারতসহ বিস্বের বিভিন্ন দেশের অভিঙ্গুতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শুধু আইন,আদালতে কমিশন করে মানবাধিকার রক্ষা করা যাবেনা। এর জন্য চাই প্রতিনিয়ত গণ আন্দোলন, নাগরিক সচেতনতা, এবং শিক্ষার প্রসার।নতুবা মানবাধিকার রক্ষার আবেদন শোচনীয় হয়ে দাঁডাবে।

----XXXX-----

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সাহিবা খাতুন, স্নেহা দাস ও পূজা কয়াল, সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৯৩ সালে

মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন (Protection of Human Rights Act,1993) পাস করে।এই আইনের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই কমিশন নতুন দিল্লীর ভিত্তিক কিন্তু কমিশনের কাজকর্ম ভারতব্যাপী সম্প্রসারিত। ভারত অবশ্যই বহু বছর পরে এই আবেদনে সাড়া দেয়। ফলে ১৯৯৩ সালে প্রথম ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। তারপর রাজ্যন্তরে ও মানবাধিকার কমিশন গঠিত



কমিশন গঠনের সূচনা:-ভারতে মানবাধিকার কমিশন গঠনের পেছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমালোচনার জন্যই ভারত এই কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস তার "নির্বাচনী কর্মসূচিতে" একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। নরসিমা রাও সরকার ১৯৯৩ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারি করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের ঘোষণা করে। পরের মাসেই অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের ১২ অক্টোবর মানবাধিকার আইন ১৯৯৩ অনুসারেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার রক্ষা আইন সহ ভারতীয় সংবিধানে মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধারা রয়েছে। ১৯৯৩ সালের আইনে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য গুলির জন্য রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করার সংস্থান রয়েছে। এর ফলে মানবাধিকার যথাযথ ভাবে সুরক্ষিত হবে।

কমিশনের উদ্দেশ্য সমূহ:- মানবাধিকার লজ্ঘনের ঘটনার অনুসন্ধান , বিচারের জন্য মানবাধিকার লজ্ঘনের অভিযোগ আদালতে পেশ করা , সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে সরকারের কাজে সুপারিশ করা প্রভৃতি পথে কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে

উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। এ জাতীয় চমকপ্রদ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল মানব মর্যাদা ও অখণ্ডতার মূর্ত প্রতীক এবং গণতন্ত্রের মৌলিক শৃঙ্খলা রক্ষায় অবদান রাখা যাতে সকল ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষিত হয় এবং মানবাধিকারের মান উন্নত হয় দেশটি।

গঠন:- সংগঠন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ বিধানের অধীনে গঠিত হয়েছিল। এটি গণ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলন ও চুক্তি গুলো সংবিধান অনুসারে প্রতিটি মানুষের মর্যাদাবোধ , মূল্য এবং স্বাধীনতা সহ বিস্তৃত অর্থ মানবাধিকার অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদার দিক থেকে একে একটি বিচার বিভাগীয় সংস্থা বলা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সভাপতি সমেত মোট সদস্য সংখ্যা ৮ জন। সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে আইনের উল্লেখ আছে।

- ১) ভারতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের ভিতর থেকে কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।
- ২) সুপ্রিমকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভিতর থেকে একজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়।
- ৩) যে কোন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিচারপতিদের ভিতর থেকে একজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়।
- 8) মানবাধিকারের ক্রিয়াকারি হিসাবে সুপরিচিত বা মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তি বর্গের ভিতর থেকে ২ জন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়।
- ৫) পদাধিকার বলে কমিশনের সদস্য হল ৩ জন -
- (ক) সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি।
- (খ) তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি।
- (গ) মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি।

তাছাড়া কমিশনের একজন মহাসচিব থাকেন। ভারত সরকারের সচিব পর্যায়ের একজন আধিকারিক এই পদে নিযুক্ত করা হয়। মহাসচিব হলেন কমিশনের প্রশাসনিক অধিকারী। তিনি তার ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করেন এবং ক্ষমতা ভোগ করেন।

নিয়োগ পদ্ধতি:- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি কে নিযুক্ত করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করার আগে রাষ্ট্রপতি একটি কমিটির কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করেন। এই কমিটি গঠিত হয় নিম্নোক্ত পদাধিকারীদের নিয়ে: (ক) প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী

হলেন এই কমিটির সভাপতি , (খ) লোকসভার স্পিকার , (গ) ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , (ঘ) লোকসভার বিরোধী দলের নেতা এবং (চ) রাজ্যসভার সহ-সভাপতি। এই কমিটির সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতি কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করতে পারেন না। আবার কমিশনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য একজন মহাসচিব ও একজন ডিরেক্টর জেনারেল নিয়োগের ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাধুবাদযোগ্য।

সভাপতি ও সদস্যদের কার্যকাল:- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে পাঁচ বছরের কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সভাপতির বয়স সত্তর হলে তাকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কমিশনের সদস্য ও পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন।

পদচ্যুতির পদ্ধতি:- ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের অপসারিত করতে পারেন । দুটি ক্ষেত্রে বা কারণে রাষ্ট্রপতি তাদের অপসারিত করতে পারেন (ক) প্রমাণিত অসদাচরণ বা দুর্নীতি মূলক ক্রিয়াকর্ম এবং (খ) সদস্যদের অসামর্থ্য।

কতকগুলি কারণের জন্য কমিশনের কোন সদস্য সদস্য থাকার পক্ষে অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন, (ক) কোন সদস্য যদি দেউলিয়া ঘোষিত হন, (খ) কমিশনের সদস্য থাকাকালীন যদি অন্য কোন চাকরি গ্রহণ করেন; (গ) অসুস্থতার কারণে কোন সদস্য শারীরিক বা মানসিকভাবে অসামর্থ্য হয়ে পড়লে, (ঘ) আদালত কোন সদস্যের নৈতিক অপরাধের জন্য কারাদণ্ড হলে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা:- একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিযুক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের সুবাদে নিশ্চিত হয় যে, কমিশন হল একটি নিরপেক্ষ সংস্থা।

পদমর্যাদা:- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই অধিককাল তার অস্তিত্বকে অতিবাহিত করেছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কমিশনের সামর্থ , সদিচ্ছা ও সক্রিয়তা ইতি মধ্যে প্রমাণিত। তাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হলো একটি বিধিবদ্ধ ও স্বশাসিত সংস্থা।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী: ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংরক্ষণ আইনের ১২ ধারায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচনা আছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্র সমূহের কার্যাবলী সম্পাদন করে বা ক্ষমতা ভোগ করে।

- (১). মানবাধিকার লজ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে কমিশন যাবতীয় অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।এক্ষেত্রে কমিশন নিজের থেকে, অভিযোগের ভিত্তিতে বা প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করতে পারে।
- (২). ওই রূপ কোনো বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকলে আদালতের অনুমোদন নিয়ে মধ্যস্থতা করতে পারে।
- (৩). মানবাধিকার লজ্ঘন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কোনো সরকারি আধিকারিক বা কর্মচারীর কর্তব্য পালনের ব্যর্থতার বিষয়ে কমিশন অনুসন্ধান করে।
- (৪), কারাগারের অবস্থা পরিদর্শন করতে পারে।
- (৫). মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সংবিধানের ধারা ও আইন পর্যালোচনা করে ওই বিষয়ে আরো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।
- (৬). মানবাধিকার মূলক আইনের যথাযথ রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।
- (৭). মানবাধিকার লজ্ঘনকারী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারের জন্য সুপারিশ করতে পারে।
- (৮). মানবাধিকার বিষয়ে সব আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র বিশ্লেষণ করে সে গুলো কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করতে পারে।
- (9),মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দেয়।
- (১০).মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজকর্মে উৎসাহ দেয়।
- (১১).মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের চেষ্টা করে।
- (১২).মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনা স্থির করে।

মূল্যায়ন: উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে ,জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা মূলত সুপারিশ মূলক প্রকৃতির।মানবাধিকার লজ্যনকারীকে শাস্তি দেওয়ার কোন ক্ষমতা কমিশনের নেই।আবার ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে আর্থিক বা অন্যবিধ প্রতিকার প্রদানের ক্ষমতা নেই। ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংরক্ষণ আইনে প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া মানবাধিকার লজ্যন জনিত যাবতীয় অপরাধের সত্তর বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি মানবাধিকার আদালতে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আজ পর্যন্ত ভারতের পনেরোটি মত অঙ্গরাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গড়ে তোলা হয়েছে।



রাজ্য মানবাধিকার প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন

সৌরভ মন্ডল, অয়ন নস্কর ও সুদীপ সরদার, সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানবাধিকার বলতে সাধারণত অর্থে যা বোঝানো হয় তা হল একটি রাষ্ট্রের নাগরিক তার রাষ্ট্র থেকে যে সমস্ত অধিকার বা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং যে সমস্ত অধিকার জাতি , ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকার মানুষের সহজাত গুণাবলী , বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে

পারে এবং ব্যক্তির আত্মরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম
তাকে মানবাধিকার বলে। ভারতীয় সংবিধানে
মানবাধিকার কে একটি পবিত্র ও অলজ্যনীয় মৌলিক
অধিকার রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সেই সম্পর্কে
আমরা সম্পূর্ণ সচেতন যে এই অধিকার গুলো অবশ্যই
বিচারযোগ্য, কিন্তু এগুলো রূপায়ণ করা খুবই
কন্টসাধ্য। যাই হোক মানবাধিকার রূপায়নের সমস্যা
যতই কঠিন হোক না কেন, যাদের জন্য এই অধিকার

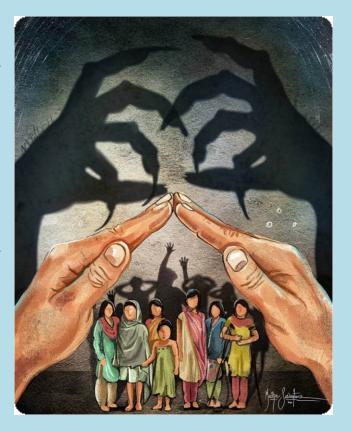


গুলি তৈরি করা হয়েছে তারা যদি এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে গণতন্ত্র কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না।

ভারতে মানবাধিকার: ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর সংবিধানের স্রষ্টারা সংবিধানের মধ্যে মানবাধিকার লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুসারে সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার , চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার এবং মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। সর্বোপরি, সংখ্যালঘু এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি গুলির জন্য কতগুলি বিশেষ ধরনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্র টিকে ভারত সরকার ১৯৭৯ সালের ১০ এপ্রিল

অনুমোদন করেন। এরপর ১৯৯৩ সালে
'মানবাধিকার রক্ষা আইন' প্রণীত হয়। এই আইন
অনুসারে এই বছর গঠিত হয় "জাতীয় মানবাধিকার
কমিশন"। পশ্চিমবঙ্গ ও ১৯৯৫ সালের ৩১
জানুয়ারি রাজ্য সরকার একটি গেজেট
নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার
কমিশন গঠন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন: ভারতে
মানবাধিকার কমিশন গঠনের পর ১৯৯৫ সালে ৩১
জানুয়ারি একটি রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত
হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আরো কয়েকটি রাজ্যে
মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় সেগুলি হল
হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অসম।



পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা হল 5 এটি যখন গঠিত হয় যে সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠিত হয় তারা হলেন-

- 1. হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত একজন সভাপতি।
- হাইকোর্টের বর্তমান অথবা প্রাক্তন বিচারপতিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত একজন সদস্য।
- 3. পশ্চিমবঙ্গের জেলা আদালত গুলির বর্তমান অথবা প্রাক্তন বিচারপতিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত একজন সদস্য।
- 4. মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত দুজন সদস্য।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন চিত্রতোষ মুখোপাধ্যায় , কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন সামসুদ্দিন আহমেদ , রামপ্রসাদ সমাজদার, উমা আমেদ এবং রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ভারতের জাতীয় স্তরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পন্ন করে থাকে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন সেই একই কাজ সম্পন্ন করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সংঘটিত মানবাধিকার লভ্যনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।

সূরা হায় হেল্প লাইন মানবাধিকার কমিশনের: কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে তার জন্য রাজ্য সরকার সবরকম চেষ্টা করলেও কোথাও কোথাও যেখান থেকে যাচ্ছে , ১৭ এপ্রিল ২০২০ যেমন অভিযোগ এসেছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে ও কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিশ চন্দ্র গুপ্ত বলেন, সরকার খাবারের ব্যবস্থা করলেও সেটা শরবত হয়তো ফলপ্রসূন্য। তিনি বলেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে কোন অভিযোগ এলে তিনি আমাদের বা চেয়ারম্যান কে জানাবেন। তিনি বলেছেন প্রশাসন , পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট অধিকারী কের সঙ্গে কথা বলে যাতে সমস্যার সমাধান করা যায় তার চেষ্টা করবেন।

মন্তব্য: ১৯৯৫ সালে ৩১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। এই সংস্থাটি বহু জায়গায় বহু মানবাধিকার লংঘন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বা তার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। এই সংস্থাটি প্রচুর পরিমানের সফল না হলেও বলা যেতে পারে যে মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা মর্যাদায় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানগুলি প্রতিফলিত করে। মানবাধিকার মানুষকে আশ্বাস দেয় যে তারা খাদ্য , আশ্রয় এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় উপায় থাকবে এবং সেই সুযোগ সুবিধা গুলি সবার জন্য উপলব্ধ থাকবে।

----XXXX----

ভারতে মানবাধিকার রক্ষায় সিপিডিআর (PDR) এর ভূমিকা।

মিনাক্ষী মণ্ডল

সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

অধিকার একটি সামাজিক ধারণা। অধিকার বলতে সেই সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কে বোঝানো হয় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। মানুষের অধিকারের কথা বলা আর মানবাধিকারের কথা বলা এক নয়। মানবাধিকার বলতে সাধারণত মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন

ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কে বোঝানো হয়। রাষ্ট্রীয় অত্যাচার বা অমানবিক আচরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার গুলি কে বিশেষভাবে মানবাধিকার বলে উল্লেখ করা হয়। কোন কোন তাত্ত্বিক এর মতে মানবাধিকার হলো সাধারণ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু বিশেষ অধিকার। কেউ কেউ মনে করেন মানবাধিকার বলতে মানুষের সেই মৌলিক অধিকার গুলি কে বোঝায় যেগুলি একান্তই মানবিক এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট , সীমিত এবং সংকীর্ণ



অধিকারের থেকে পৃথক। ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে "মানবাধিকার হলো ব্যক্তির জীবন , স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার " যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত।

ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল "সিভিল লিবার্টি কনফারেন্স "যেখানে মানুষের হতাশার ছবি উঠে এসেছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়রা যেটুকু সীমিত অধিকার ভোগ করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেগুলো ভোগ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ১৯৬০ এর দশকে থেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে মিথ্যার লড়াই এর অজুহাতে বহু ব্যক্তিজীবনের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। এই প্রেক্ষিত কে মাথায় রেখে ১৯৭২ সালে কলকাতায় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক

রাইটস (APDR) গঠিত হয়। এছাডাও ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হয় এবং এপিডিআর সংগঠন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ এর উপর নিষেধ আজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতি এই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে মান্ষের অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং সর্বভারতীয় ভাবে বহু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে অন্যতম হল মুম্বাইয়ের একটি সংগঠন 'কমিটি ফর দ্য প্রটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস ' (CPDR) এটি ১৯৭৭ সালে গঠিত হয়েছিল। সিপিডিআর এর মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে তা গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা। সিপিডিআর ছাড়াও আরো অনেক গুলো সংগঠন ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠেছিল পিইউসিএল, এপিডিআর এই সংগঠন গুলি ১৯৮০ দশক থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যেমন রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিচারে আটক করা বিরুদ্ধে, পুলিশের হেফাজতে অত্যাচার এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিনা গণআন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে এই সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং আইনের পথে সরকারের অন্যায় কাজ কর্মের প্রতিবাদ করা হয়। এই সংগঠনগুলির শুধুমাত্র নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে গরিব মানুষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, মহিলা এবং শিশুদের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে কারণে ব্যক্তিগত অধিকার এর পাশাপাশি গোষ্ঠীর অধিকারের ব্যাপারে ও মানুষকে সচেতন করে তোলা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে ভারত সরকার ১৯৯৩ সালেঅর্ডিন্যান্স জারি করে 'মানবাধিকার রক্ষার আইন' চালু করে এবং ওই বছরই ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

সিপিডিআর এর সদস্য জন্য বিধি ও ক্রিয়া-কলাপ:

- ১। মানবাধিকার সিপিডিআর ইন্ডিয়ার সদস্য হওয়ার জন্য যে নথিগুলি প্রয়োজন-ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেশন কার্ড,পাসপোর্ট, ভাড়া বিল,বৈদ্যুতিক বিল, বিএসএনএল টেলিফোন বিল, প্রবেশপত্রের কার্ড মাধ্যমিক।
- ২। যারা রাজ্য, জেলা, ব্লক, থানা দায়িত্বে রয়েছেন তারা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিধি ও নিয়ম মেনে চলবেন।
- ৩। কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য কে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কাজ এবং নীতি সম্পর্কিত গোপনীয়তা বজায় রাখতেহবে।

- 8। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে থানা কমিটির সকল সদস্যকে তার ভর্তির এক মাসের মধ্যে তাদের বায়োডাটা কেন্দ্রীয় কমিটি জমা দিতে হবে।
- ৫।কেন্দ্রীয় কমিটির জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধনকারী প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত এবং মনোনীত করবে।
- ৬। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে থানা কমিটি পর্যন্ত সকল সদস্যকে একটি নিবন্ধক রক্ষণ করতে হবে। যেখানে সদস্যদের নাম, ঠিকানা, বয়স, ফোন নম্বর পেশা গুলি নিবন্ধিত হবে এবং নিবন্ধের জেরক্স কপি প্রতি চার মাস অন্তর প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
- ৭। কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি তদন্ত করে অভিযোগের চিঠি গ্রহণ করতে হবে এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন সদস্য এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।
- ৮। মানবাধিকার সিপিডিআর ভারতের সদস্য অন্য কোন মানবাধিকার সংস্থার সদস্য হতে পারবেন না।
- ৯। নেতৃত্বাধীন যারা তাদের অধীনে সদস্যদের সদস্য বাড়াতে চেষ্টা করা উচিত।
- ১০। মানব অধিকার সিপিডিআর ভারতের নাম সম্বলিত ভিজিটিং কার্ড এবং গাড়ি স্টিকার ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নেওয়া উচিত।
- ১১। সংস্থাটি শিল্প ও বেকার যুবকদের স্থানের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।
- ১২। প্রতিবছর ১৫ ই আগস্ট হাসপাতাল ,নার্সিংহাম,বৃদ্ধাশ্রম, শিশুর যত্ন, বাড়িতে রোগীদের ফল এবং মিষ্টি বিতরণ এর কর্মসূচি।
- ১৩। কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বের সাথে সমন্বয় করে সভার আয়োজন করতে হবে। ১৪।শিক্ষক এবং পিতামাতা কে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
- ১৫। অভাবী সাংবাদিক এবং শিল্পীদের সহায়তা করতে হবে এবং তাদের সাথে একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- ১৬।পুলিশ অফিসার দের প্রতি সমবেদনা পোষণ করা উচিত কারণ তারাই আইনের প্রহরী। ১৭। দরিদ্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।
- ১৮। বাল্যবিবাহ কঠোরভাবে বন্ধ করতে আদালতের রুল গুলি উল্লেখ করার জন্য সমক্ষে।
 সিপিডিআর এর উল্লেখযোগ্য কতগুলো কাজ মানবাধিকার রক্ষায়:

- ১। মানবাধিকার সিপিডিআর ইন্ডিয়া ভারত ঘাটালের বন্যার্তদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাবার, পানীয় জল প্রেরণ করেছিল। সমস্ত ভারতের সেক্রেটারি বিপ্লব ঘোষ এবং অন্যান্য সদস্যরা ৩৫ মিলিয়ন রাস্তা ভ্রমণ করেছেন। ২০ কিলোমিটার দূরত্বে বন্যার শিকার ৫০০ পরিবারকে ত্রাণ সরবরাহ করেছিল।
- ২। ঘাটালের পরে আমাদের মানবাধিকার সিপিডিআর ইন্ডিয়া সদস্যরা দাসপুর পলাশপাই, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ২ 00 জনের নিখরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতায় বিকাশ এবং ইএসআই হাসপাতাল মানিকতলা আন্তর্জাতিক লায়ন্সক্রাব এর সহায়তায় সাহায্য করি।
- ৩। মানবাধিকার সিপিডিআর ভারত স্বরূপ নগর শাখা দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ সহায়তা করেছিলেন ছবিতে সমস্ত ভারতের সচিব বিপ্লব ঘোষ ডাক্তার অরবিন্দ সরকার ডাক্তার কুদ্ধুস রহমান ইত্যাদি।

মানবাধিকার রক্ষায় সিপিডিআর এর ভূমিকা আজকাল ভারতে প্রায়সই গণমাধ্যমে এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় মানবাধিকার লজ্মনের অভিযোগ শোনা যায়। যা কখনো রাজ্য ভিত্তিক কখনো সর্বভারতীয় মানবাধিকার কমিশনে যে অভিযোগ নথিভুক্ত হয় সেই নিয়ে অনুসন্ধান চলে। কমিশনের মতামত প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। অনেক সময় অভিযুক্ত হয় রাষ্ট্র , রাষ্ট্রের সরকার, পুলিশ বাহিনী অনেক সময় অনুচ্চারিত থেকে যায় সাধারণ মানুষের মানব অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনী। একই সাথে প্রতি নিহত সমাজে উচ্চবর্ণের আক্রমণ নিম্নবর্ণের ওপর , পুরুষের আক্রমণ মহিলাদের ওপর, শিশু নির্যাতন, নারী পাচারের মত মানবাধিকার লজ্মনের ঘটনা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই এই বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা গুলির মানবাধিকার রক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ। সিপিডিআর এর মত মানবাধিকার সংস্থা তারা মানুষের কাছে লিখিত আকারে প্রতিশ্রুতি দেয়-ভারত আপনার বসবাসের জন্য আরো ভালো জায়গা হবে আপনার আন্তরিক সহযোগিতায় এই মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সিপিডিআর ইন্ডিয়া কেবল পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে নয় বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাবে।

ভারতে মানবাধিকার রক্ষায় APDR- এর ভূমিকা

সঙ্গিদা ইয়াসমিন,

সেমিস্টার-৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

মানব পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য , সব্রজনিন সহজাত ,অহস্তান্তর যোগ্য এবং অলজ্ঘনীয় অধিকারই হল মানবাধিকার। সাধারণ ভাবে মানবাধিকার বলতে সেই সমস্ত অধিকার কে বুঝায় যেগুলো ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। মানবাধিকার এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষের অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন বা প্রশান্তির বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব উথান্ট এর বক্তব্য অনুযায়ী, মানুষের রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মানবাধিকারের উদ্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (APDR) বিভিন্ন ভাবে যারা নিপীড়িত তাদের মানবাধিকার লংঘন সনাক্তকরণ ও ঘটনার তথ্য সংগ্রহ, ঘটনার বিশ্লেষণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান উকিল পরিচালনা করার মাধ্যমে জন সচেতনতার প্রচার করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংসতা থামানোর জন্য প্রচেষ্টা চালায়। অন্যান্য NGO গোষ্ঠীগুলির মতোই মানবাধিকার গোষ্ঠী গুলির ও সরকারি করের অন্তর্ভুক্ত। এই সংগঠন গুলি তে সিয়া বদ্ধতা ও আইনি নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয় তা হল-

- 1. বেসরকারি হতে হবে অর্থাৎ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা সরকারি প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে।
- 2. এই সংস্থাটির সহিংসতা ব্যবহার করেনা বা প্রচার করে না বা অপরাধের সাথে স্পষ্ট সংযোগ রাখেনা।
- একটি আইন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি কাঠামোর সাথে একটি আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব থাকতে হবে।
 মানবাধিকার গোষ্ঠী সমাজের সকল সদস্যের জন্য

কিছু সরকারি সংস্থা রয়েছে যাদেরকে মানবাধিকার গোষ্ঠী বলে নামকরণ করা হয়েছে । যেমন-যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গোষ্ঠী। তবে এমন প্রতিষ্ঠান গুলি মূলত নীতি নকশার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

একই অধিকার রক্ষার চেষ্টা করবে।



এবং প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য স্থাপিত।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় APDR এর ভূমিকা:

আাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশান অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (APDR) দেশব্যাপী নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের একটি অঙ্গ। ১৯৭২ সালের দীপঙ্কর চক্রবর্তীর হাত ধরে এই সংস্থার কাজ শুরু হয় ।সভাপতি হন কাপিল ভট্টাচার্য রাষ্ট্রপতি , সহ সভাপতি হন- এস এম , কল্যাণী ভট্টাচার্য (মুক্তিযোদ্ধা, রাষ্ট্রপতি, সমাজকর্মী)। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ তালিফ, বরেন্দ্র কৃষ্ণদা, শ্রী সুরোজ চক্রবর্তী , অমিও বসু , সঞ্জয় মিত্র প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় এর প্রথম কমিটি । পরবর্তীকালে যারা এই সংস্থার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করেছিলেন তারা হলেন-ভারতীয় মেডিকেল কমিশনের অন্যতম সদস্য ডক্টর ধীরেন গাঙ্গুলী , নাট্যকার উৎপল দত্ত, অভিনেত্রী শোভা সেন, ISI এর অধ্যাপক ডক্টর ডিপি অধিকারী , তেভাগা আন্দোলনের নেতা শ্রী রাসবিহারী ঘোষ , লোকসভা C.P.I. সদস্য শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, আরো অনেকে।

13 ই আগস্ট 1971 কাশিপুর বরানগরে, একরাতে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে কয়েকশো ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে নির্বিশেষে হত্যা করা হয়েছিল এবং কারো হাত কাটা পা কাটা পড়ে । জীবিত অর্ধ মৃতদেহগুলোকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় । এছাড়া "জেলে হত্যা", "জিজ্ঞাসাবাদের" নামে থানার মধ্যে অত্যাচার, গণহত্যা এসব লেগেই আছে । সারা রাজ্য জুড়ে তখন অশান্তির আগুন জ্বলছিল APDR-শুরু থেকেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস , পুলিশি হত্যার ও অত্যাচারের অবসান , মিথ্যা মামলা , কারা কানুন প্রত্যাহার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। APDR মানবাধিকারের মতো নাগরিকদের রাজনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকারের গুরুত্ব দেয়। তাই সব ধরনের প্রতিবাদ মূলক মহান কাজে এই সংস্থা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লকডাউন পরিস্থিতিতে APDR-এর রাজ্য জুড়ে সংঘটিত কর্মসূচি:

কোনরকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই সরকার করোনা ভাইরাস জনিত অতি মারির মোকাবিলা করার জন্য প্রথমে জনতা কার্ফু ২২/৩/২০২০ এবং সেই রাতে লকডাউন ঘোষণা করে ।মুখ থুবড়ে পড়া বেহাল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে মানুষের চিন্তা চেতনা কে প্রায় অসাড়তা পর্যবসিত করে, কিছু কর্মসূচি পালনের বিধান দিয়ে , সমস্ত বিষয় টিকে একটা জাতীয়তাবাদী ভাঙনে মুড়ে ফেলে লকডাউন মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। এইরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে APDR যে সমস্ত কর্মসূচি পালন করে সেগুলি হল-

লকডাউন এর সময় এই সংস্থা পানিহাটি শাখা ও বিজ্ঞান চেতনা ও আহ্বান সংগঠনের সাথে যৌথভাবে 500 টি পরিবারের মধ্যে কমিউনিটি কিচেন পরিচালনা করে অসহায় পরিবারগুলিকে খাদ্য সরবরাহ করে। লকডাউন এর ফলে বহু গুরুতর রোগী যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত , হাড ও কিডনির সমস্যায় ভুগছেন কিন্তু ঠিকঠাক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এরকম একটি কেস ঘটে রামনগর থানার নেওদা গ্রামের। এরকম ঘটনার প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার জেলার জেলা হাসপাতালে মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় APDR. স্বাস্থ্য কমিদের মারফত এলাকা ভিত্তিক এরকম রোগী দের তালিকা তৈরি করতে এবং তাদের কাছে সঠিক চিকিৎসা পোর্শছে দেওয়ার দাবি জানায় APDR. পরিযায়ী শ্রমিক দের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বাড়াইপুরের মহকুমা শাসক , ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক , ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় APDR. স্বাস্থ্য কর্মীদের মারফত এলাকা ভিত্তিক এরকম রোগীর তালিকা তৈরি করতে এবং তাদের কাছে সঠিক চিকিৎসা পোর্শছে দেওয়ার দাবি জানায় APDR।

ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কমিটির সহায়তায় CAA, NRC বাতিলের দাবিতে ২৮/২/২০ ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের কাছে মিছিল সহযোগে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় এই সংস্থা । লকডাউন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পর থেকেই নিয়মিত মহেশতলার বিভিন্ন পাড়ায় যেমন-নোয়াপাড়া , ময়নাগর, বাটানগর, জালখুরা, সন্তোষপুর, মেটিয়াবুরুজ বটতলা অঞ্চল , আকড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে APDR। লকডাউন এর সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকা বনজীবী মানুষের। বহু আগে থেকেই বনদপ্তর এর কাজে বাধা দেয় । কাঁকড়া ধরতে , নদীতে জাল নামাতে , মধু আনতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর এর পরেই ঘোষিত হয় লকডাউন। এই বিপর্যয়ে বহু পরিবার অর্ধাহারে-অনাহারে রয়েছে। APDR এই সমস্ত মানুষের হাতে ত্রাণ তুলে দেয়। এছাড়াও কলকাতা জেলা, নিদয়া জেলা, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে APDR.

মন্তব্য: APDR পশ্চিমবঙ্গের একটি মানবাধিকার সংগঠন। যেটি ১৯৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তার কিছুকাল পরে আবার এটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় এবং ৭০-এর দশকে এটি আবার কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় দমনের বিরোধিতা করার কাজ এই সংগঠনটি চালিয়ে গিয়েছে এবং এখনও মানবাধিকার রক্ষায় এই সংগঠনটি সক্রিয় ভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মানবাধিকারের বিবিধ প্রসঙ্গ

লিঙ্গ বৈষম্য ও মানবাধিকার

তনুশ্রী কাড়ার, মাসকুরা ঈষিতা সদ্দার, নারগিস পারভিন, সেমিস্টার-৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

ভূমিকা:- মানব সভ্যতার ইতিহাস মানুষের জীবন ও তার মর্যাদার প্রতি অসম্মানের পূর্ণ ঘটায়। বিশ্বব্যাপী বিবিধ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য বর্তমান। এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মধ্যে মানবাধিকারের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।তবে মানবাধিকারের বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য সার্বিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এক্ষেত্রে প্রধানত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জো এবং তার বিশেষ কিছু সংগঠন ও আঞ্চলিক আন্তঃসরকার সংগঠন সমূহ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে।

মানবাধিকারের পউভূমি:- প্রাচীন কালের সকল সমাজ ও জীবনধারায় অধিকার ও নীতি সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা বিকশিত হয়েছে। মানবাধিকারের ধারণার উৎপত্তি নবজাগরণের যুগে এবং পরবর্তীকালে সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় মধ্যে নিহিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকার ধারণা কম বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়। মানবাধিকারের নতুন ধারণা মূলক অভিব্যক্তির সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর সার্বজনীনতা।

সংজ্ঞা:- মানবাধিকার বা হিউম্যান রাইটস কথাটি দুটি শব্দ তথা হিউম্যান রাইটস নিয়ে গঠিত হয়েছে। মানব অধিকার হলো সেই অধিকার যা মানুষের সুস্থ , সুন্দর ও শান্তিময় জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়। মানবাধিকার শব্দের মাধ্যমে মানুষের অধিকার কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের জীবন অধিকার এবং মর্যাদা পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধা গুলো হলো মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা মানবাধিকার

সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে , মানব পরিবারের সকল সদস্যদের সহজাত এবং সমান পরিত্যাজ্য অধিকারের স্বীকৃতি হল স্বাধীনতা , ন্যায় বিচার ও বিশ্ব শান্তির ভিত্তি, অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে মানব অধিকার স্বীকৃত হবে। এক কথায় বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য মানুষের যে সকল অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত তাদেরকে মানবাধিকার বলে।

লিঙ্গ বৈষম্যের সংজ্ঞা :- পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বুনিয়াদ কে সুদৃঢ় করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে সুচতুর পুরুষ বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় নিয়ম এর মাধ্যমে নারীর অবদমন করার চেষ্টা করেছে। এইসব নিয়ম নারীকে সমাজের উপযুক্ত করে তুলতে বাধা দিয়েছে। তার ফলে সেকেন্ড জেন্ডার হয়ে থেকে যে এই ধর্মীয় বিধান কন্যাসন্তানকে অবাঞ্ছিত বলে তাদের শিক্ষা আদর-যত্নে সবসময় খামতি দেখা যায়। তুলনায় পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানানো হয়।তার শিক্ষায় বেড়ে ওঠার কোনো আপস করা হয় না। পিতার সম্পত্তির অধিকারের দাবিদার হয় পুত্র।

বিবাহের পর নারীকে পতিগৃহে যেতে হয় পুরুষকে নয়। স্বামী/পুরুষ হলেন গৃহকর্তার স্ত্রী থাকবেন তাঁর অধীনে স্ত্রীর কর্তব্য হলো সন্তান প্রতিপালন , আহার তৈরি, সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখা, রোগীর সুস্থতা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ নারীর স্থান ঘরের ভিতরে বাইরে যাওয়ার অধিকার তার নেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর তাই নারীর আর্থ-সামাজিক হীনতার অন্যতম কারণ। শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার জন্য কর্মক্ষেত্রে ও নারীর সুযোগ অনেক কম অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমান কাজ করে ও পুরুষের তুলনায় নারীর মজুরি কম , উচ্চপদে রাজনীতিতে বা সেনাবাহিনীতে অথবা খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় দেখা যায় না। এসব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য বেশি।

নারীরা পুরুষ শাসিত ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় সমাজের জন্ম মুহূর্ত থেকেই সারা জীবন নানা অবিচার ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলে। ঘরে ও বাইরে তার অবস্থান এক সব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য করলে তার আত্ম প্রসঙ্গে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। তারা শোষিত , নির্যাতিত,নিপীড়িত।১৮২৯ সালে ব্রিটিশরা সতীদাহ প্রথা আইন বন্ধ করে। ১৮৫৬ সালে প্রণীত হয়

বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইন। ব্রিটিশ আমলের এই আইনগুলো নারীদের অবস্থান কিছু প্রতিকার করেছিল। কিন্তু তাদের বিশেষ সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি। উনিশ শতকে নারীদের জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার বিস্তার করা হয় । বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পটভূমি তৈরি হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ১৯১৯ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভোটাধিকার এবং আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও আইন দ্বারা সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করেছে। উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। ফলের নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা-

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থাটির মধ্যে নারীর অধিকার কে আরো সুসংহত ভাবে প্রয়োগ করার কথা ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা ঘোষণাপত্রের কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল। উপরোক্ত ঐতিহাসিক কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে নারী অধিকারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং নারীর প্রতি সব রকমের বৈষম্য দূরীকরণ ও তা কার্যকর করার জন্য দৃঢ় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে ১৯৯৫ সালে ৪-৫ চেম্বার চীনের বেজিং শহরে অনুষ্ঠিত হয় নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন যেখানে নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমাজে নারীর অবস্থার উন্নয়ন এবং শিক্ষার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়।

নারীর অধিকার বিষয়ক চেতনা প্রসারের জন্য রাষ্ট্রসংঘ কয়েকটি বিশ্ব সম্মেলন (world conference) আয়োজন করেছে ,যথা- (১) কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক ২৪-৩০ জুলাই ১৯৮০ (রাষ্ট্রসংঘ নারী দশক - ১৯৭৬-৮৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত) (২) নাইরোবি , কেনিয়াতে ১৫-২৬ জুলাই ১৯৮৫।

নাইরোবি সম্মেলন এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সব রকমের বৈষম্যমূলক আচরণের নিরসন। Monitoring Mechanism-লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিকারের জন্য গৃহীত ১৯৭১ সালের রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক চুক্তির অন্তর্গত বিভিন্ন ধারা গুলো বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ আছে চুক্তির ১৭ নং ধারায়। এই ধারা অনুযায়ী ২৩ জন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ (অধিকাংশই তাদের মধ্যে হবেন নারী) নিয়ে এরূপ কমিটি গঠিত হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে CEDAW কমিটির প্রতিবেদন পাঠাবে। ধারা ১৮ অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকে পাওয়া প্রতিবেদন গুলো বিবেচনা করা হলো কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিটিকে সাধারণত জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতি প্রণালী বা State Reporting Procedure বলে অভিহিত করা হয়। State reporting procedure পদ্ধতি অনুসারে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের কি বা কতটুকু পালিত হল , সে বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্র গুলির বক্তব্য এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে CEDAW কমিটি পর্যালোচনা করবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে নারীর প্রতি সংঘটিত হিংসার বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে CEDAW কমিটি ১৯৯২ সালে ১৯ নং সাধারণ সুপারিশ বা General Recommendation no.19 পেশ করে। যদিও এই বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে লিঙ্গবৈষম্য প্রতিকার চুক্তিতে নির্দেশিত ছিল না, তা সত্ত্বেও কমিটির মনে হয়েছিল যে হিংসা মূলক ব্যবহার নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কেই প্রতিফলিত করবে।

অতএব নারীর অধিকার রক্ষার্থে ,মহিলাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য নিবারণের জন্য চুক্তিটি আজ সবচেয়ে ব্যাপক ও আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক একটি দলিল। একদিকে একটি রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারী বর্গের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটায়। অন্যদিকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সমাজ জীবনে , নারী ও পুরুষের সমতা সুনিশ্চিত করে। সর্ব প্রকার লিঙ্গ বৈষম্য বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত চুক্তি "নারীর আন্তর্জাতিক Bill of Rights" হিসাবে প্রচলিত। নিন্মলিখিত ক্ষেএ গুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য লজ্মন লক্ষ্য করা যায় লিঙ্গ বৈষম্য কয়েক টি কারণ কয়েক বছর ধরে বিশ্ব লিঙ্গ সমতা অর্জনের আরো কাছাকাছি পৌঁছেছে। রাজনীতিতে নারীর আরও ভালো প্রতিনিধিত্ব রয়েছে আরও অর্থনৈতিক সুযোগ রয়েছে। তবে World Economic forum এর অনুমান সত্য লিঙ্গ সমতা বাস্তব পরিনত হওয়ার আগে এটি আরও একটি শতান্দী নেবে ।

লিঙ্গ গুলির মধ্যে ব্যবধান টি কি চালিত করে? এখানে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ গুলো হলোঃ- প্রথম, বিশ্ব জুড়ে শিক্ষায় অসম উপলব্ধি এখনো পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষায় কম উপলব্ধি রয়েছে। ১৫-২৪ বছরের মধ্যে ৪ যুবতি প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করবে না। এই গোষ্ঠীটি ৫৮%লোককে এই প্রাথমিক শিক্ষাটি সম্পন্ন করেনা। বিশ্বের নিরক্ষর সকলের মধ্যে নারী। মেয়েরা যখন ছেলেদের মতো একি স্তর এ শিক্ষিত না হয় , তখন এটি তাদের ভবিষ্যতের এবং তারা যে ধরনের সুযোগ পাবে তার উপর এটির বিশাল প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়, কর্মসংস্থানের সাম্যতার অভাব বিশ্বের কয়টি দেশের মহিলাদের কে পুরুষের মতো একি আইনি কাজের অধিকার দেয়। বেশিরভাগ অর্থনীতি নারীকে পুরুষের অধিকার দেয় মাএ চার জন। অধ্যায়গুলি দেখায় যে কর্মসংস্থান যদি আরো বেশি খেলার মাঠে পরিণত হয় তবে লিঙ্গ বৈষম্য ঝুঁকির মধ্যে থাকা অন্যান্য ক্ষেত্রে এটির ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে | তৃতীয়, চাকরির পৃথকীকরণ কর্মসংস্থানের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ হলো চাকরির বিভাজন । বেশিরভাগ সমাজে একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস রয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ পরিচালনার জন্য পুরুষরা আরো ভালোভাবে সজ্জিত। বেশিরভাগ সময় এই চাকরি গুলি সর্বোত্তম অর্থ প্রদান করে। এই বৈষম্যের ফলস্বরূপ মহিলাদের আয় কম হয়। অবৈতনিক শ্রমের জন্য মহিলারা প্রাথমিক দায় বদ্ধতা গ্রহণ করেন তাই তারা বেতনের কর্মী হিসাবে অংশ নেয়ার পরেও তাদের অতিরিক্ত কাজ রয়েছে যা কখনো আর্থিকভাবে স্বীকৃতি পায় না। চতুর্থ, আইনে সুরক্ষার অভাব বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুসারে এক মিলিয়নের বেশি মহিলার যৌন সহিংসতা অর্থনৈতিক বা ঘরোয়া অর্থনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষা নেই। উভয়ই নারীদের সাফল্যলাভ এবং স্বাধীনতায় বেঁচে থাকায় ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। অনেক দেশে কর্ম ক্ষেত্রে, স্কুলে এবং জনসাধারণের দ্বারা হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষার অভাব রয়েছে।

---XXXX----

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা ও মানবাধিকার

রাকিবা খাতুন তৌসিফা খাতুন, সেমিস্টার-৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

"সংখ্যালঘু" শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের কোথাও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। তবে সংবিধানের ধারা ৩০(১) অনুসারে "সংখ্যালঘু" হিসেবে সেই গোষ্ঠীকে গণ্য করা যায় যাঁদের ধর্মীয় বা ভাষাগত বৈচিত্র্য আছে। যে গোষ্ঠী কোনো রাজ্যের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের কম বিদ্যমান , এরূপ ব্যক্তি বৃন্দকে "সংখ্যালঘু" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে "সংখ্যালঘু" বলতে কী বোঝায় সেদিকে আলোকপাত করা যাক,

সংখ্যালঘুদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের সনদে বলা হয়েছে----

"জাতীয়, ধর্মীয় এবং জাতীয় সংখ্যালঘু"।

ইউরোপীয় পরিষদ ১৯৯৩ অনুসারে-

"সংখ্যালঘু" হচ্ছে----

রাম্ব্রের একটি জনগোষ্ঠী যাঁরা;

- ১) রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্রিয় সীমানায় বসবাস করে।
- ২) রাষ্ট্রের সঙ্গে দৃত বন্ধনে আবদ্ধ।
- ৩) সুনির্দিষ্টভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, ধর্ম বা ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান;
- 8) পর্যাপ্ত পটিনিধিত্মসালি ; যদিও সংখ্যায় রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার অথবা রাষ্ট্রের কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার তুলনায় কম।

বৈশিষ্ট্য

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী গুলোর স্বীকৃতি দিতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য গুলি সঙ্গায়ত করা বা প্রতিষ্ঠা করা সমাজে প্রতিনিধিত্বকারি বৈচিত্রের কারণে জটিল হয়ে যায়।

১) স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য---

এই বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে ত্বকের রঙ বা সংস্কৃতি এবং ভাষার দিকগুলি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চেয়ে আলাদা।

২) বাস্তুচ্যুত-----

সাধারণত, যারা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তৈরী করেন তারা সাধারণত এমন লোক যারা তাদের আদি অঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত হন।

৩) ক্ষতিগ্রস্ততা ---

সংখ্যালঘুরা এমন একটি দল যা দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ এটি ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

"ভাষাগত সংখ্যালঘু" এমন একটি গোষ্ঠী যা মাতৃভাষাকে বজায় রাখে। পরিস্থিতির দ্বারা বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা নিয়ে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর অংশ তৈরি করে।

ভারতীয় সংবিধানে সকল ভাষাভাষীদের এমনকি লিপি হীন ভাষাভাষীদের সংবিধানের ধারা ৩০(১) অন্তর্ভুক্ত করে 'ভাষাগত সংখ্যালঘু ' র পরিচয় প্রদান করা হয়েছে কারণ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের ক্ষমতার অধিকার বজায় রাখা।

ভারতবর্ষে, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্যোগ এ যে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা হল ,"জাতীয় সংখ্যালঘু সংক্রান্ত নিয়োগ আইন , ১৯৯২" এই আইনে বলা হয়েছে যে ,"সংখ্যালঘু" বলতে সেই সকল গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চিহ্নিত। এই আইনে অনুযায়ী একটি জাতীয় আয়োগ গড়ে ওঠে যা সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন কার্যাবলী ও তার বাস্তবায়ন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

কার্যাবলী গুলি হল-সংবিধান এবং অন্যান্য আইন এ যে সকল অধিকার সংখ্যালঘুদের প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করা। যে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার লজ্যিত হচ্ছে সেসব বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনীয় বিধি বলে দেওয়া যাতে এই অধিকারগুলো ভবিষ্যতে খর্ব না হয়।

ভারতীয় সংবিধানে আলোকপাত করে দেখা যাক "সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়ের অধিকার গুলি "ধারা ২৯: সংখ্যালঘু বর্গের অধিকার সংরক্ষণ করা।

ধারা ২৯(১): ভারতবর্ষের নিবাসী নাগরীকের এমন কোনো অনুভাগ যার নিজস্ব কোনো ভাষা ,লিপি অথবা সংস্কৃতি আছে; তার সেই ভাষা, লিপি অথবা সংস্কৃতি বজায় রাখার অধিকার থাকবে।

ধারা ২৯(২): এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি রাষ্ট্রের মাধ্যমে শোষিত হয় বা রাষ্ট্রীয় নীতি এর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয় , সেখানে প্রবেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নাগরিককে কেবল তার ধর্ম মূল্যবোধ জাতি বা ভাষার ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না ৷"

ধারা ৩০: শিক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বর্গের অধিকার।

ধারা ৩০(১): ধর্ম বা ভাষাভিত্তিক সমস্ত সংখ্যালঘু বর্গের নিজ অভিরুচি অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনা করার অধিকার থাকবে।

ধারা ৩০(২): শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে সাহায্য বিতরণ করার সময় , সরকার কোনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ধর্ম কিংবা ভাষাভিত্তিক কোনো কারণে বৈষম্য করবে না।

এবার ধারাগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে----

২৯(১) ধারা অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ ঘটানোর অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২৯(২) ধারা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা , তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে কারণ কোনো ব্যক্তির শিক্ষা প্রদানে কোন রকম বৈষম্য করা আইনত অপরাধ বলে পরিগণিত হয়।

৩০ ধারা অনুযায়ী সকল সংখ্যালঘু ব্যক্তির সকলের সমান অধিকার রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার।বিশেষ করে ধর্মগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু বর্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তা পরিচালনা করার অধিকার সংবিধানে প্রদও।

অবশেষে বলা যায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার' মৌলিক অধিকার' রূপে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "সংখ্যালঘু" শব্দটির সাংবিধানিক সঙ্গা না থাকলেও ধারা ২৯ এবং ৩০ এর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি সংরক্ষণের দ্বারা তাদের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শিশু সুরক্ষা এবং মানবাধিকার

শারমিন নাজ, নাজনীন সুলতানা, সাবানা খাতুন, শাহিনা পারভীন ও সাবিনা খাতুন, সেমিস্টার - ৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

আন্তর্জাতিক স্তরে শিশুদের মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন রাষ্ট্র সাম্যের কর্তৃত্বে উত্থাপিত হয় বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। রাষ্ট্র সাম্যের সাধারণ সভায় প্রস্তাবনা সংখ্যা ৪৪/১২৫ এর মাধ্যমে "কনভেনশন অন দা রাইট অফ দ্যা চাইল্ড " বা শিশু অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি

উত্থাপিত হয় দৈ। গৃহীত হওয়ার এক বছর সময়ের মধ্যেই এই চুক্তিটি বলতে হয়ে যায় ১৯৯০ এর ২ সেপ্টেম্বর সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হলো শিশু যাদের বয়স 18 বছরের কম। অনেক দেশেই শিশু ও তরুণ তরুণীদের সংখ্যা সে দেশের মোট



জনসংখ্যার অর্ধেক। বর্তমানে এক বৃহৎ সংখ্যক রাষ্ট্র বা বলা যেতে পারে বিশ্বের প্রায় সময় রাষ্ট্রেই (১৯৩) টি উপরোক্ত চুক্তিতে সম্মতি জানিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , গোঁসাইগাঁও দক্ষিণ সুদান চুক্তিপত্রে অনুমোদন জানায়নি। শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রথম ধারাটিকে শিশু বা "চাইল্ড" কথাটির উল্লেখ দেওয়া হয়েছে। ধারা অনুযায়ী শিশু থাকা যাদের বয়স 18 বছরের কম এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শিশু অধিকার সম্পর্কিত (১৯৮৯) সালের আন্তর্জাতিক টি চুক্তিটিতে শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণি যথা (পেরি) সিভিল রাজনৈতিক (পলিটিকাল) অধিকারের কথা যে রকম বলা আছে, কিভাবে সমস্ত অর্থনৈতিক (ইকোনমিক) সামাজিক (সোসিয়াল) ও সাংস্কৃতিক (কালচারাল) অধিকারের কথা ও সমানভাবে ঘোষণা হয়েছে। শিশু অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ধারায় বলা হয়েছে অংশগ্রহণকারী

রাষ্ট্রগুলি তে এখন সমস্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য যাতে চুক্তিতে উল্লেখ বিভিন্ন অধিকার গুলি কে বাস্তব রূপ প্রদান করা যায় এবং সেটা করতে শিশুর স্বার্থই যেন সর্বাগ্রে বিবেচিত হয় মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করা হয় না মানব অধিকারের ইতিহাসে এক বিশেষ মাইলফলক এবং সেটি যেন মূলনীতি হতে পারে বা হয়ে ওঠে।

শিশুদের মানবাধিকার:--

শিশুদের মানব অধিকার কারও চেয়ে কম নয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মাল্টিপল ক্লাস্টার ইন্ডিকেটর সার্ভে ২০১৯ ' অনুযায়ী ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৮৯ শতাংশ শিশু পরবর্তী এক মাসের মধ্যে শারীরিক শাস্তি শিবদর হয়েছে। জরিপে আরও দেখা যায়, ৩৫ শতাংশ অভিভাবক মনে করেন শিশুদের শাস্তির প্রয়োজন আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তির নিষিদ্ধ করতে ২০১১ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষকদের দ্বারা মারধর ও অপমানের শিকার হচ্ছে নিঃসন্দেহে শীর্ষ মানবাধিকার ভয়াবহ লংঘন। ২০১৩ সালে 'গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপরাল পানিশমেন্ট অফ চিল্ডেন' অর্থাৎ 150 টিরও বেশি গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে শারীরিক শাস্তি ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে। শিশুর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সামগ্রী বিকাশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কোন পর্যন্ত সাতটি দেশ ৬০টি শিশুর শারীরিক নির্যাতন সংস্থা নিষিদ্ধ করেছে। গবেষণায় দেখা যায়, শারীরিক শাস্তি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হলে এ বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাপকতা কমতে থাকে। কোন ১৯৭৯ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে শিশুদের সব ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ করে সইডেন। ১৯৭০ এর দশকে দেশটির প্রায় অর্ধেক শিশু নিয়মিত মারধরের শিকার হতো যা কিনা অন ১৯৮০ এর দশকে এক-তৃতীয়াংশ এবং ২০০০ সালের পর মাত্র কয়েক শতাংশে নেমে এসেছে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬.২ নম্বর লক্ষ্যে বলা হয়েছে , ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে হবে কারণ শিশু মানবাধিকার কার ও চেয়ে কম নয়।

শিশুদের মানবাধিকার লংঘন:--

- (১) অসচ্ছলতার কারণে অনেক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।
- (২) অনেক শিশু ক্ষেত-খামার, ইটের ভাটা, জমি জমার, কাজ করে।

- (৩) বিনা কারণে নির্যাতন। (শহরাঞ্চলে দেখা যায় ছোট ছোট বাচ্চাদের দোকানে বা বাড়িতে কাজ করে শুধুমাত্র দুবেলা খাবার পাওয়ার জন্য)
- (৪) অনেক শিশু গৃহহীন। (বারবারিক সামর্থ্য না থাকার কারণে। শিশুটি নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত)
- (१) विप्ता भाषात ।

শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত সরকারের পদক্ষেপ :---

ভারতীয় সংবিধানে শিশুদের জন্য কিছু অধিকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় নথিবদ্ধ আছে যেমন্;

- ১: সাম্যের অধিকার (14 নং ধারা)
- ২: বৈষম্যহীনতার অধিকার (15 নং ধারা)
- ৩: নারী এবং শিশুদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা (15 (3)নং ধারা)
- 8: জীবন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার (21 নং ধারা)

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার নির্দিষ্ট আইন :---

নিম্নলিখিত আইন গুলি শিশু সুরক্ষা সাথে সম্পর্কিত আছে যেমন;

- ১: বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন (২০০৬)
- ২: শিশু শ্রমিক আইন, (১৯৮৬)
- ৩: কিশোর ন্যায় বিচার আইন (২০০০)এবং আইনি সংশোধন,(২০০৬)
- ৪: শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯)
- ৫: যৌন নিগ্রহ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন । (২০১২)

বর্তমানে শিশু সুরক্ষার জন্য প্রকল্প চালু আছে :---

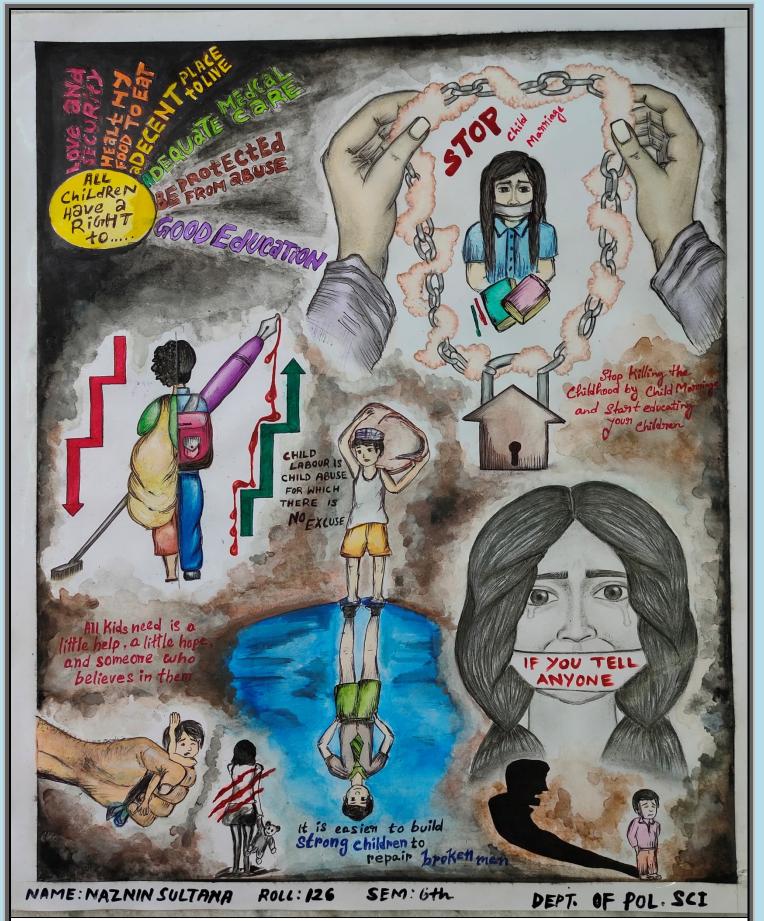
পশ্চিমবঙ্গের শিশু সুরক্ষা শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রকল্প গুলি চালু আছে সেগুলি হল্,

- ১: কিশোর ন্যায় বিচার বিষয়ক একটি কর্মসূচি।
- ২: পথশিশুদের জন্য একটি সুসংহত কর্মসূচি।
- ৩: শিশু গৃহ কর্ম পরিকল্পনা ও দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মসূচি।

- 8: অন্যায়, অবহেলিত, দুর্যোগ কবলিত, বঞ্চনার শিকার, মানসিক ভারসাম্যহীন শিশুদের জন্য আবাস।
- ৫: আইনের জন্য সংঘাতে লিপ্ত শিশুদের জন্য আবাস।
- ৬: ন্যায় বিচার প্রদানে বিধিবদ্ধ সংস্থা।
- ৭: অনাথ ও দুঃখ শিশুদের জন্য আবাস।
- এছাড়া আর ও অন্যান্য শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রকল্প গুলি চালু আছে;
- ১: যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষা সুরক্ষা প্রদান কর্মসূচী।
- ২: জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়।
- ৩: মানুষ পাচার রোধ এর জন্য এবং পাচারের শিকার শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য উজ্জ্বলা প্রকল্প। উপসংহার :----

উপরোক্ত সর্বক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণে শিশু সুরক্ষা ও মানবাধিকারের প্রসঙ্গ অধিকার থাকবে এছাড়াও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির শিশুদের বিভিন্ন রকমের অনাচার ও বিপদ থেকে সুরক্ষিত করার দায় বদ্ধতা সদস্য রাষ্ট্র গুলির উপর ন্যস্ত করে। এক্ষেত্রে বলা জরুরী যে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশু শিশুর জন্য পারিবারিক সুরক্ষা ও তার বেড়ে ওঠার শান্তিপূর্ণ ও স্বাস্থ্য পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। সামাজিক অনাচার ও অত্যাচার , ঘরে ও বাইরে হিংসা প্রবণতা দুর্ব্যবহার, শোষণমূলক আচরণ ইত্যাদি থেকে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক স্তরে শিশুদের অধিকার "3p's" দিয়ে নির্ধারিত করা সম্ভব মানবাধিকার চুক্তিতে উল্লেখিত সমস্ত অধিকারী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তবে কোথাও কোথাও শিশু মানবাধিকার লজ্মন হয়েছে। তবে বর্তমানে ভারত সরকারের পদক্ষেপ এর ফলে শিশু মানবাধিকার বর্তমানে অনেকটাই সুরক্ষিত হয়েছে। তবে শিশু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানব অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যখন্তিত।

পরিশেষে বলা যায় , মানব অধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণা পৃথিবীর সকল মানুষের মন একটি সদর্থক আশার সঞ্চার করেছে। যার ফলাফলস্বরূপ মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আবার সমাজের প্রতিভার কর্তব্য সম্পর্কে ও তাকে সজাগ করার পথ ব্যাখ্যা করা রয়েছে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণা পাত্রে।



Poster Drawing: Naznin Sultana, 6th SEM, Hons, Department of Political Science

উদ্বাস্ত্র সমস্যা ও মানবাধিকার

শঙ্কর গায়েন , আবিদ হোসেন মল্লিক ও অমিয় প্রামানিক সেমিস্টার - ৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

1951 সালে রাষ্ট্রসজ্যের সাধারণ সভার করুন অবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয় | উদ্বাস্ত সংক্রান্ত চুক্তির (UN Convention Relating to the status of Refugees) প্রথম ধারণাটি (Article 1) উদ্বাস্ত বা রিফিউজি শব্দটির অর্থ

ব্যাখ্যা করে এই ধারা অনুযায়ী: একজন উদ্বাস্ত হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার নিজের রাষ্ট্র পরিত্যাগ করেছেন কোন ভীত সংক্রান্ত কারণে যথা জাতি ধর্ম কোন ভীত সংক্রান্ত কারণে যথা জাতি ধর্ম কোন নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এরূপ ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করেন এবং ভীত সংক্রান্ত কারনটি বর্তমানে বিদ্যমান থাকতে সে নিজ রাষ্ট্রের সুরক্ষা হতে অক্ষম বা অনিচ্ছক।



সুতরাং উদ্বাস্ত ব্যক্তি কে চিহ্নিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করা হয় 1951 সালে উদ্বাস্ত সংক্রান্ত ইউনাইটেড নেশন চুক্তির মাধ্যমে উদ্বাস্ত কাকে বলে এবং ও তারা কি প্রকৃতির আইনি সুরক্ষা তথা অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি লাভ করতে পারেন এ বিষয়ে 1951 সালের চুক্তিতে বলা হয়েছে যেসব রাষ্ট্র উপরোক্ত চুক্তি গ্রহণ করেছেন , তাদের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সকল উদ্বাস্ত মানুষের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

উদ্বাস্ত সম্বন্ধে উচ্চ অধ্যক্ষের দপ্তর:

জেনেভায় অবস্থিত উদ্বাস্ত সম্বন্ধে উচ্চ অধ্যক্ষের কার্যালয় বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানব সাহায্যকারী সংস্থা এবং পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মরত , তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ব্যক্তি (Field Worker) হিসেবে উদ্বাস্ত শিবির গুলিতে যুক্ত। এই সংস্থাটি 120 টির

বেশি রাষ্ট্র কর্মে নিয়োজিত এবং প্রতি মুহূর্তে বহু উদ্বাস্ত ও স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সাহায্য ও সুরক্ষা প্রদান করে চলেছে।

উদ্বাস্ত সংক্রান্ত উচ্চ অধ্যক্ষের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে চলেছে ও বিভিন্ন ধরনের সাহায্য প্রদান এর সাথে যুক্ত যথা - উদ্বাস্ত অধিকার , বসবাসের স্থান এবং খাদ্য প্রদান, চিকিৎসা ব্যবস্থা, চাকুরীর সুযোগ প্রদান, শিক্ষাগত সাহায্য প্রদান, আইনি সাহায্য প্রদান, সমাজ জীবনে একতাবদ্ধতা

1951 সালে রাষ্ট্রসভেষর সাধারণ সভার দারা উদ্বাস্ত সংক্রান্ত উচ্চ অধ্যক্ষের কার্যালয় স্থাপিত হয়। কার্যালয়টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় 1.5 লাখ ইউরোপীয় উদ্বাস্ত সুরক্ষা প্রদান। উপরোক্ত কার্যালয়টি তার সূচনালয়ের সাধারণ সভার একটি অঙ্গ রূপে কাজ করতে চায় এবং সকল প্রকার কার্যের প্রতিবেদন সাধারণ সভার কাছে পেশ করা । ধীরে ধীরে এই দপ্তর একটি স্বাধীন দপ্তরে পরিণত হয় । বর্তমানে এই সংস্থার সকল প্রকার কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য 57 টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি কার্যকরী কমিটি (Exclutive Committee) রয়েছে যা সংস্থাটির কার্যক্রম সুর্গুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

উদ্বাস্ত এবং মানবাধিকারের সংজ্ঞা অনুসারে কোন ব্যক্তি কে উদ্বাস্ত আখ্যা তখনই দেওয়া যাবে যখন সেই ব্যক্তি তার রাষ্ট্র পরিত্যাগ করেছে নিম্নলিখিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে--

- (১) কোন ভীতি সংক্রান্ত কারণে যেখানে ব্যক্তির জীবিত থাকার অধিকার তথা স্বাধীনতার অধিকার খর্ব হয়েছে বা আশঙ্কা রয়েছে।
- (২) বিভিন্ন কারণে যথা জাতি ধর্ম জাতিত্ব কোন নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের ফলস্বরূপ,
- (৩) যখন এই ভীতি নিজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে,
- (৪) নিজ রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন অনির্দিষ্ট,
- (৫) বর্তমানকালে এপ্রকার অসুরক্ষিত হবার ভীতি বিদ্যমান।

১৯৫১ সালের চুক্তি অনুসারে কিছু কিছু ব্যক্তি নিজ দেশের বাইরে অবস্থান করে থাকলেও উদ্বাস্ত পরিধির বাইরে -যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে , প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপর্যয় কালে , অর্থনৈতিক কারণে।

উদ্বাস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের তুলনা করা যায়। অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত বলতে সেই সকল ব্যক্তি কে বোঝায় যাদের একজন উদ্বাস্ত ব্যক্তির সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও একটি প্রাথমিক পার্থক্য রয়েছে। তারা তাদের রাষ্ট্র পরিত্যাগ করতে পারেন নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতবর্ষের কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা হলেন অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত ব্যক্তি।

বিগত শতাব্দীর পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ উদ্বাস্ত ব্যক্তিরা যে সকল রাষ্ট্র থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন যে সকল রাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনা

বিদ্যমান: আফগানিস্তান, ইরাক পূর্বকালীন, যুগোস্লাভিয়া, কঙ্গো, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন, এবং লাইবেরিয়া।

অধিকার:- বাস্তব শব্দটি বহু প্রকারের ভাব এবং চিন্তা প্রকাশ করে ! উদ্বাস্ত আখ্যাটি শুনলে মনে বহু পরিচিত কিছু ছবি ভেসে ওঠে একদল বিচ্ছিন্ন মানুষ



তাদের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে প্রাণে রক্ষার্থে এক প্রান্ত থেকে আরেক রাষ্ট্রের সীমারেখা অতিক্রম করেছে বহু মহিলা জল এবং কার্ড বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ছোট শিশুরা সামান্য খাদ্যের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে বহু আঘাত প্রাপ্ত এবং দুঃখে বিময মানুষজন যারা সর্বপ্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং মানবাধিকার লজ্মনের প্রত্যক্ষদর্শী। উদাহরণস্বরূপ :- ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ বিভাজনের সময় যে ট্রেন গুলি পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তদের বহন করে আন্ত , সেই দূর্ভাগ্যজনক মানুষগুলোর ছবি আজও আমাদের মনে সজীব রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , উদ্বাস্ত আখ্যা সেসব ব্যক্তিদের দেওয়া যায় না যারা:-এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রের প্রচলন করেছে অর্থনৈতিক কারণে , মানবতার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপরাধ সাধন করেছে , যে সকল ব্যক্তি কোন ভাবে শান্তি ভঙ্গ করেছে এবং যে সকল ব্যক্তি কোন প্রকার যুদ্ধ সংক্রান্ত অপরাধ (war crimes) সাধন করেছে।

১৯৫১ সালের উদ্বাস্ত সংক্রান্ত চুক্তি এবং ১৯৬৭ সালের ঐচ্ছিক প্রটোকল এর মধ্যে সারা বিশ্বের সকল উদ্বাস্ত বিষয়ে কিছু মানব অধিকার ভোগের অধিকার। লক্ষণীয় বিষয় হলো সেই সব রাষ্ট্র ১৯৫১ সালের চুক্তি এবং ১৯৬৭ সালের ঐচ্ছিক প্রটোকল গ্রহণ করেনি সেই সব রাষ্ট্রীয় উদ্বাস্তদের সমস্ত অধিকার মেনে চলা হয় তথা মর্যাদা ও সম্মান আরোপ করা হয়।

একজন উদ্বাস্তর সর্বোপরি এবং প্রাথমিক মানবাধিকার হল আশ্রয় গ্রহণের অধিকার (right asylum) ১৯৫১ 51 সালের জেনেভা চুক্তি অনুসারে চুক্তি অনুসারে উদ্বাস্ত ব্যক্তি ভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে যথা:-চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সাহায্য।

বর্তমানে উদ্বাস্ত সংক্রান্ত উচ্চ অধ্যক্ষের দপ্তর দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে বহু উদ্বাস্ত আশ্রয় পেয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করেছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্বাস্তদের সর্বপ্রকার মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু কার্যকলাপ পরিচালিত করা হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হলো সেইসব উদ্বাস্তদের স্থনির্ভরশীল করে তোলা যাতে তারা সর্বপ্রকার মানবাধিকার এবং



স্বাধীনতা মর্যাদা সম্পূর্ণ ভাবে ভোগ করতে পারে।

Refugee Camp

References

- 1. Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/
- 2. Human Rights Watch, https://www.hrw.org/
- 3. WBHRC, http://www.wbhrc.nic.in/
- 4. NHRC https://nhrc.nic.in/
- 5. UNHR, https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
- 6. UNHCR https://www.unhcr.org/
- 7. কুমারেশ চক্রবর্তী, ভারতের বর্তমান রাজনীতি প্রশাসন ও বিশ্ব , প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৭
- 8. শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রিনী মুখোপাধ্যায়, ভারতের সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থা, ওয়াল্ড প্রেস , ২০১৫,

- - - The End - - -